মহান একুশে

আবদুর রউফ চৌধুরী

উৎসর্গ

১৯৪৯, ১৯৫২ ও ১৯৬১'-র

রাষ্ট্রভাষা, বাংলাভাষা ও বরাক উপত্যকার

ভাষা-আন্দোলনের কর্মী ও শহীদবৃন্দের উদ্দেশ্যে

এবং

নবপ্রজন্মের যারা দেশ ও জাতির ভবিষৎ

তাদের মনে রাষ্ট্রভাষা ও ভাষা-আন্দোলনে উদ্দীপ্ত রাখার বাসনায় ।

একটি রক্তপিচ্ছিল পথ

রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন ও ভাষা-আন্দোলন

'ধর্মভিত্তিক' পাকিস্তান রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই রাষ্ট্রভাষার সমস্যা তীব্রভাবে প্রকাশ পায়, বিশেষ করে পূর্ব-বাংলার ছাত্র-শিক্ষক মহলে আশঙ্কা দেখা দেয় যে, বাংলা ভাষা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী দ্বারা উপেক্ষিত হতে বাধ্য। আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নই যখন শাসকগোষ্ঠীর মনমগজকে প্রবলভাবে দুর্বল করে দিয়েছে, তখন অস্বাভাবিকই দেখায় যদি বাংলা ভাষার উপর তারা আঘাত না করে, অবশ্য একদল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানে বাংলা ভাষা উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্কাকে অমূলক বলে নাকচ করে দেন, তাদের মতে পাকিস্তানের গণপরিষদে বাঙালি-সদস্যবৃন্দ সংখ্যগুরু আর পাকিস্তান রাষ্ট্রে জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার দাবী মূলত ওঠে গণতান্ত্রিক নিয়মে, শতকরা ৫৬.৪০ভাগ লোক যেদেশে বাংলায় কথা বলে সেখানে বাংলার দাবীই নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য হওয়া উচিত, এছাড়া পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মধ্যে মাতৃভাষা হিশেবে ২৮.৫৫% পাঞ্জাবি, ৫.৪৭% সিন্ধি, ৩.৪৮% পস্তু ও ৩.৩৭% উর্দু; আর শুধু পশ্চিমাঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ৭.০৫% এর কথ্যভাষা উর্দু। উর্দু ভাষায় খুব কম মানুষই কথা বলতে পারে, উর্দু ভাষা পাকিস্তানের কোনো প্রদেশেরই মাতৃভাষা না। সিন্ধি, পাঞ্জাবি, পুস্তু, বেলুচি পাকিস্তানের কোনো কোনো প্রদেশের মাতৃভাষা হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে এসব ভাষায় অল্প লোকই কথা বলতে পারে।

উর্দু ভারতবর্ষের সকল মুসলমান-সম্প্রদায়ের মাতৃভাষাও নয়, এমনকী পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যেও উর্দু একটি অসম অবস্থান নিয়ে বিরাজ করে, ফলে উর্দু সংখ্যালুঘ জনগণের ভাষা আর বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা, তাই সৃষ্টি হয় বাংলা ও উর্দুর মধ্যে সংকট– দ্বন্দ্ব। সাংস্কৃতিক রাজনীতিতে উর্দু ভাষার প্রতিরোধের প্রশ্নে বাংলা ভাষার অগ্রগতি ও লবাণ্যতাকে দুর্বল করে ইংরেজি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা অত্যন্ত আবশ্যক বলে মনে করে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী; এছাড়া ইংরেজি হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক ভাষা, একে রাষ্ট্রভাষা করলে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী পেশাগত ও ব্যবসাগত ভাবে লাভবান হবে বলে অনুমান করা হয়, অন্যদিকে পূর্বাঞ্চলের মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষকে, বাংলা রাষ্ট্রভাষা না-হলে, পেশাগত ও ব্যবসাগত প্রতিযোগিতা থেকে নির্দ্বিধায় দূরে সরিয়ে রাখা যাবে; শাসকগোষ্ঠী তাই ইংরেজিকে অপসারণের কোনো প্রশ্ন তুলেনি, তুলে বাংলাকে নিয়ে।

ভারতবর্ষের মুসলমানদের ধর্ম প্রতিপালন সূত্রে আরবি ভাষার একটি সম্মানজনক স্থান থাকলেও এভাষা মাতৃভাষার স্থলাভিষিক্ত হওয়া সম্ভব নয়, আরবি ভাষার প্রতি প্রীতি কখনো মাতৃভাষা চর্চার সামান হতে পারে না, ফলে আরবি ভাষার সমস্যাটি কখনো রাজনৈতিকক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি করতে পারেনি; আর ফারসির প্রশ্ন তখন আর থাকেনি, কারণ ইংরেজ আমলে রাজভাষা ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর ফারসি তার রাজকীয় গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। আরবি, ফারসি ভাষার সঙ্গে বাঙালির সম্বন্ধ কী? ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ-প্রসঙ্গে বলেন, 'আমাদের শিক্ষার পথে প্রথমেই ভাষা সমস্যা আসিয়া পড়ে। আরবি আমাদের ধর্মভাষা, ফারসি আমাদের সভ্যভাষা, উর্দু আমাদের ভারতীয় অর্ন্তজনীন ভাষা, ইংরেজি

আমাদের রাজভাষা, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা– এই পাঁচ ভাষারই সহিত আমাদের অল্পবিস্তর সম্বন্ধ আছে।'[১]

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী?

'ধর্মভিত্তিক' পাকিস্তান রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের পূর্বেই– মাউন্টব্যাটেনের 'রোয়েদাদ' বা 'ভারতবর্ষ-বিভাজন'-এর পরিকল্পনাটি ঘোষিত (৩রা জুন ১৯৪৭) হওয়ার আগে– 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে' এ-নিয়ে তর্কবির্তক শুরু হয়। 'একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে'– এরকম একটি শ্লোগান প্রথম প্রকাশ পায়, ১৭ই মে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে, হায়দ্রাবাদে, উর্দু-সম্মেলন 'মজলিস-এ-ইত্তেহাদুল মুসলেমিন'-এর বার্ষিক অধিবেশনে, নিখিল ভারত মুসলীম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য চৌধুরী খালিকুজ্জামানের সভাপতির অভিভাষণে; তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষার প্রশ্নটি একটি রাজনৈতিক প্রশ্নে পরিণত হয়েছে, কারণ হিন্দি ভাষাকে ভারতবর্ষের জাতীয়-ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা হিশেবে প্রচলিত করার জন্য কংগ্রেসের সদস্যরা সোরগোল তুলছে, এরূপ প্রচেষ্টার পশ্চাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত আছে। কংগ্রেস হিন্দিকে হিন্দুস্তানি বলে অভিহিত করে তাদের আসল উদ্দেশ্য গোপন করার চেষ্টা করছে, কেননা তাদের এরূপ আচরণের প্রকৃত কারণ হচ্ছে তারা উর্দু ভাষাকে পুঙ্গ করে মুসলমানের সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বহুলাংশে বিলুপ্ত করে দিতে চায়। উর্দু কেবল মুসলমানের ভাষা নয়, উর্দু লক্ষ লক্ষ হিন্দুরও ভাষা। কংগ্রেস যতই চেষ্টা করুক না কেন, বিরাট সংখ্যক লোক যে-ভাষা গ্রহণ করেছে সে-ভাষার মৃত্যু হতে পারে না।[২]

চৌধুরী খালিকুজ্জামানের মন্তব্য 'একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে' প্রকাশের পরপরই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয় বাঙালি বুদ্ধিজীবী, লেখক ও সাংবাদিক মহলে; এরইসঙ্গে সমকালীন চিন্তাভাবনার আলোকে পত্রিকার পাতায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিশেবে মূল্যায়ন করার প্রসঙ্গগুলি উত্থাপিত হতে থাকে। এ-আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন প্রাবন্ধিক আবদুল হক। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুন থেকে আগস্টের মধ্যে তিনি ভাষাসমস্যা নিয়ে মোট চারটি প্রবন্ধ লিখেন, যথা– 'বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব'[৩], 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'[৪], 'উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে'[৫] ও 'পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'[৬]। প্রথম প্রবন্ধে তিনি শিক্ষিত সমাজের বাঙালিরা যেভাবে ইংরেজি, উর্দু ও হিন্দির প্রতি 'পক্ষপাত' করে বাংলার উপর 'হীনমন্যতা'র পরিচয় দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে বলিষ্ঠ মন্তব্য প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষার, বিশেষ করে বাংলা ও উর্দুর, মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা ও বাংলা ভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিশেবে সম্মানজনক আসনে বসানোর দাবী জানান। তৃতীয় প্রবন্ধে তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন যে, বাংলা ভাষার উপর বাঙালি মুসলমানেরই অধিকার বেশি। চতুর্থ প্রবন্ধে তিনি দুটি রাষ্ট্রভাষা– বাংলা ও উর্দুর দাবী তুলে ধরেন (প্রবন্ধটি মিসেস এম. এ. হক ছদ্মনামে 'বেগম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়)।

রাজনৈতিকভাবে উর্দুর পক্ষে দ্বিতীয় মন্তব্য প্রকাশ পায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে। হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত এক উর্দু-সম্মেলনে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডা. জিয়াউদ্দীন আহমদ বলেন,

[১] বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা, বৈশাখ ১৩২৫ বঙ্গাব্দ।
[২] দৈনিক আজাদ, ১৯শে মে ১৯৪৭।
[৩] ইত্তেহাদ, ২২শে ও ২৯শে জুন ১৯৪৭।
[৪] দৈনিক আজাদ, ৩০শে জুন ১৯৪৭।
[৫] ইত্তেহাদ, ২৭শে জুলাই ১৯৪৭।
[৬] সাপ্তাহিক বেগম, ৩রা আগস্ট ১৯৪৭।

'উর্দুকেই নিখিল পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।' ডা. জিয়াউদ্দীন আহমদের মন্তব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আলোড়ন সৃষ্টি হয় বাংলায়, এমনকী ভাষাতত্ত্ববিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রতিবাদ প্রকাশ করেন তাঁর 'পাকিস্তানের ভাষা-সমস্যা'[৭]-শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পূর্ব-বাংলাকে 'পাকিস্তান'-নামক নবরাষ্ট্রটির একটি অংশ হিশেবে মেনে নিয়ে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে ও উর্দুকে 'দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা' হিশেবে গ্রহণ করার পক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করেন। 'পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি'র সদস্য হিশেবে, একই প্রবন্ধে, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শিক্ষাগুরুদের লক্ষ্যে ভাষাশিক্ষার পদ্ধতি ও পন্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিক্ষাব্যবস্থার একটি পরিকল্পনা প্রস্তাব ও সকল প্রদেশের শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষা ব্যবহারের সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এ-প্রবন্ধ সম্বন্ধে আবদুল হক বলেন, 'জুলাইয়ের শেষদিকে দৈনিক 'আজাদ'-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ড. শহীদুল্লাহ [...] বাংলাকে পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রভাষারূপে, এবং উর্দুকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। আরবি এবং ইংরেজিকেও তিনি অনুরূপ মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সেইসময় তিনি যুক্তিসিদ্ধ বাস্তব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন একথা বলা কঠিন, তবে এ প্রশ্নে তাঁর অভিমতের গুরুত্ব এখানে যে তিনি একমাত্র উর্দু-রাষ্ট্রভাষার দাবীকে সমর্থন করেননি।'[৮]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষাভাষী মানুষের আবাসভূমি পূর্ব-বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ ঘোষণা করেন, 'বাংলা দেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দি ভাষাকে গ্রহণ করা হইলে, ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতার নামান্তর হইবে। ডা. জিয়াউদ্দীন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে ও উর্দুর সপেক্ষ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি একজন শিক্ষাবিদরূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। ইহা কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও নীতি বিরোধীই নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি বহির্গতও বটে।'[৯] প্রসঙ্গত, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের সাধারণ-ভাষা হিশেবে যখন রবীন্দ্রনাথ হিন্দির পক্ষে মত প্রকাশ করেন, তখন ড. শহীদুল্লাহ এ-মন্তব্যের বিরোধিতা করে সাধারণ ভাষা হিশেবে বাংলা ভাষার দাবী তুলেন, তবে উর্দুর দাবী অগ্রগণ্য, তারপর বাংলা, তারপর হিন্দি। তিনি তাঁর বক্তব্যে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন, তারপর একে ভারতবর্ষের অন্যতম সাধারণ-ভাষা করার দাবী উত্থাপন করেন। তিনি ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরও বলেন যে, শুধু ভারতবর্ষে কেন, সমগ্র এশিয়া-মহাদেশেই বাংলা ভাষার স্থান সর্বোচ্চে। ভাবসম্পদ ও সাহিত্যগুণে বাংলা ভাষাই এশিয়া-মহাদেশের ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে অদ্বিতীয়।[১০] অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার বলেছেন, 'বাংলা ভাষা ভারতের লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা হতে পারে কিনা এ-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে শান্তিনিকেতনে পাঠ করেন। সভায় ডা. তারাপুরওয়ালা, বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিদগণ ও বর্তমান প্রবন্ধের লেখক উপস্থিত ছিলেন। মৌলবী সাহেব বলেন, ইংরেজি, উর্দু ও হিন্দির পর আবশ্যক সংস্কার করিলে বাংলাকে ভারতের সাধারণ-ভাষায় পরিণতি করা যেতে পারে। ডা. তারাপুরওয়ালা বাংলার এরূপ কোনো আশা আছে বলে মনে করেন না। তিনি হিন্দি ছাড়া আর কোনো ভাষায় আমাদের লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা হবার সম্ভাবনা দেখেন না।'[১১]

[৭] দৈনিক আজাদ, ২৯ জুলাই ১৯৪৭।
[৮] ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব, ১৯৭৬।
[৯] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আমাদের ভাষা সমস্যা, ঢাকা, ১৯৪৯।
[১০] মোসলেম ভারত, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, বৈশাখ ১৩২৭ (১৯২০)।
[১১] মোসলেম ভারত, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, বৈশাখ ১৩২৭ (১৯২০)।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের জন্য বাংলা ভাষার যোগ্যতা নিরূপণ করা ও উর্দুকে গ্রহণের যৌক্তিকতা নিয়ে যে তর্কবিতর্ক ওঠে, এতে যোগ দেন ফররুখ আহমদ, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কাশেম, ড. মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ ভাষাবিদ ও পণ্ডিতগণ। বাঙালি মুসলমান পণ্ডিতগণের যোগদানের প্রধান কারণ ছিল রাষ্ট্রভাষা সমস্যাটি তাদের নিজস্ব সমস্যা, অবাঙালিরা রাষ্ট্রভাষা সমস্যাটিকে নিয়ে কখনই বাঙালির মত ভাবতে পারে না, ভাবার ক্ষমতাও নেই তাদের, যদিও পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃমাষা উর্দু নয়, তবুও একে প্রতিষ্ঠিত করতে তাদের কোনো রকম প্রশ্ন বা অভিযোগ ছিল না। পশ্চিমাঞ্চলের পণ্ডিতগণের মতে উর্দু তাদের নিজস্ব ভাষা থেকে অধিকতর সমৃদ্ধ ও শিল্পগৌরবে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বাঙালি পণ্ডিতগণের দৃষ্টিকোণে এ-ছিল অন্যরকম, বাংলা হচ্ছে নিখিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা, উর্দুর তুলনায় অনেক প্রবীণ, সমৃদ্ধশীল ও সম্পদশালী ভাষা; বর্ণ-শব্দ-বাক্য গঠনে ও ব্যবহারে নিপুন। তার উপর বাংলার আমজনতা উর্দু ভাষায় কথা বলতে বা পড়তে পারে না, তাই বাঙালি পণ্ডিতগণই রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের প্রশ্নটি নিয়ে তর্কবিতর্ক শুরু করেন।

ফররুখ আহমদ তাঁর 'পাকিস্তান: রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য'-শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলোচনা হয়েছে। জনগণ ও ছাত্রসমাজ অকুণ্ঠভাবে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এটা দৃঢ়ভাবেই আশা করা যায় যে, পাকিস্তানের জনগণের বৃহৎ অংশের মতানুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্বাচিত হবে। যদি তাই হয় তবে একথা নিশ্চিত যে, বাংলা ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে।'[১২] তিনি বাংলা ভাষার বিপক্ষে যারা অর্বাচীন মন্তব্য প্রকাশ করেন তাদের সম্পর্কে বলেন, 'পাকিস্তানের, অন্তত পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হবে একথা সর্ববাদী সম্মত হলেও আমাদের এই পূর্ব-পাকিস্তানেরই কয়েকজন তথাকথিত শিক্ষিতব্যক্তি বাংলা ভাষার বিপক্ষে এমন অর্বাচীন মত প্রকাশ করছেন যা নিতান্তই হাস্যকর। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় রূপায়িত করলে ইসলামী ঐতিহ্যের সর্বনাশ হবে এই তাদের অভিমত।'[১৩] বাংলা ভাষা বিরোধী লোকগুলির মনোভাবকে তিনি 'কুৎসিত পরাজয়ী মনোবৃত্তি' বলে উল্লেখ করেন, কারণ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলা ভাষার দাবীর সঙ্গে ইসলামের প্রসার ও বিকাশের কোনো সম্ভাবনা নেই; মাতৃভাষা বাংলার বিরোধীরাই 'ইসলামকে গলা টিপে মারার জন্য তৎপর' হয়ে উঠেছে। তাঁর ভাষায়, 'কী কুৎসিত পরাজয়ী মনোবৃত্তি এর পিছনে কাজ করছে একথা ভেবে আমি বিস্মিত হয়েছি। যে মনোবৃত্তির ফলে প্রায় দু'শো বছরে বাংলা ভাষায় ইসলামের প্রচার প্রায় নিষিদ্ধ ছিল সেই অন্ধ মনোবৃত্তি নিয়েই আবার আমরা ইসলামকে গলা টিপে মারার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছি।'[১৪]

ড. এনামুল হক তাঁর 'পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা'-শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, 'উর্দু ভাষার প্রতি কাহারও যে অশ্রদ্ধা আছে, তাহা নহে। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিলে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর লাভ-লোকসান কতখানি, তাহা খতাইয়া না দেখিয়া, তাকে নির্বিচারে গ্রহণ করা হলে, নিতান্তই বুদ্ধিহীনতার কাজ হবে। বিশেষ করে, যে নবীন রাষ্ট্রের মঙ্গলচিন্তায়– কেননা আমরা অমঙ্গলের কথা ভাবিতেই পারি না– উর্দুকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে প্রবর্তিত করার কথা উঠেছে, এর প্রচলনে সেই রাষ্ট্রের মঙ্গলামঙ্গল কতখানি সাধিত হবে, সে-বিষয় বিচার করে না দেখা একান্তই অদূরদর্শিতার পরিচায়ক।' তিনি এছাড়াও সুস্পষ্ট ভাষায় উর্দুকে একটি অপরিচিত বিদেশী ভাষা বলে বর্ণনা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার বিপক্ষে মত প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

[১২] সওগাত, আশ্বিন, ১৩৫৪।
[১৩] সওগাত, আশ্বিন, ১৩৫৪।
[১৪] সওগাত, আশ্বিন, ১৩৫৪।

'পাকিস্তান: রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য'-শীর্ষক প্রবন্ধে মাহবুব জামাল জাহেদী 'পাকিস্তানে বাংলা রাষ্ট্রাভাষা' প্রবর্তনের সপক্ষে দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানান। 'মিল্লাত' পত্রিকাও বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত প্রকাশ করে। পত্রিকাটি বলে যে, পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা ভাষাই হবে এ বলাই বাহুল্য। মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্যকোনো ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে বরণ করার চাইতে বড় দাসত্ব আর কিছু থাকতে পারে না। পূর্ব-বাংলাবাসীকে এই ঘৃণ্য দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধতে যদি কেউ বাসনা করে তা হলে তার সে উদ্ভট বাসনা বাঙালির প্রবল জনমতের ঝড়ের তোড়ে তৃণখণ্ডের মত ভেসে যাবে।[১৫]

পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা বাংলা– না উর্দু?

'পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা বাংলা– না উর্দু?'-নামক তমদ্দুন মজলিসের প্রচার বিভাগ থেকে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর। প্রকাশক হিশেবে পুস্তিকায় নাম ছাপা হয়েছিল অধ্যাপক এম. এ. কাশেম, এম. এস্-সি.–এর। প্রকাশকের ঠিকানা লেখা ছিল তমদ্দুন অফিস, রমনা, ঢাকা। প্রিন্টার হিশেবে নাম ছাপা হয় এ. এইচ. সৈয়দ, ঠিকানা– বলিয়াদি প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩৭-নং বংশাল রোড, ঢাকা। পুস্তিকায় তিনটি লেখা প্রকাশিত হয়। লেখক তিনজন ছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপক এম. এ কাশেম, অধ্যাপক কাজী মোতাহের হোসেন এবং আবুল মনসুর আহমদ।

অধ্যাপক আবুল কাশেম তাঁর 'আমাদের প্রস্তাব'-শীর্ষক প্রবন্ধে ভাষাসংক্রান্ত কিছু প্রস্তাব প্রকাশ করেন,

> স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা কি হবে এ নিয়ে যথেষ্ট বাকবিতণ্ডা শুরু হয়েছে। আজাদ ও ইত্তেহাদের আলোচনা, বহু নামজাদা সাহিত্যিক ও রাজনীতিকের মতামত ইত্যাদি যাচাই করে আমরা নিম্নরূপ প্রস্তাব পূর্ব পাকিস্তানের সুধী সমাজের নিকট পেশ কচ্ছি।
>
> ১। বাংলা ভাষাই হবে–
>
> (ক) পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন।
> (খ) পূর্ব-পাকিস্তানের আদালতের ভাষা।
> (গ) পূর্ব-পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা।
>
> ২। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি– উর্দু ও বাংলা।
>
> ৩।
>
> (ক) বাংলাই হবে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের প্রথম ভাষা। ইহা পূর্ব-পাকিস্তানের শতকরা একশজনই শিক্ষা করবেন।
> (খ) উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা বা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা। যারা পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে চাকুরী ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হবেন তারাই শুধু ও ভাষা শিক্ষা কর'বেন। ইহা পূর্ব-পাকিস্তানের শতকরা ৫ হতে ১০ জন শিক্ষা করলেও চলবে। মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীতে এই ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া যাবে।
> (গ) ইংরেজী হবে পূর্ব-পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা। পাকিস্তানের কর্মচারী হিসাবে যাঁরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চাকুরী করবেন বা যাঁরা উচ্চতর বিজ্ঞান-শিক্ষায় নিয়োজিত হবেন তাঁরাই শুধু ইংরেজী শিক্ষা করবেন। তাদের সংখ্যা পূর্ব-পাকিস্তানের হাজার করা একজনের চেয়ে কখনো বেশি হবে না। ঠিক একই নীতি হিসাবে পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে, ওখানের স্থানীয় ভাষা বা উর্দু প্রথম ভাষা, বাংলা দ্বিতীয় ভাষা আর ইংরেজী তৃতীয় ভাষার স্থান অধিকার করবে।

[১৫] মিল্লাত, ২৭শে জুন ১৯৪৭।

৪। শাসনকার্য ও বিজ্ঞান-শিক্ষার সুবিধার জন্য আপাতত কয়েক বৎসরের জন্য ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পূর্ব-পাকিস্তানের শাসনকার্য্য চলবে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী বাংলা ভাষার সংস্কার সাধন করতে হবে।[১৬]

অধ্যাপক আবুল কাশেমের ভাষায় এসব প্রস্তাবের প্রধান ভিত্তি ছিল– দেশের শক্তির অপচয় না করে দেশের জনগণ যে-ভাষায় সহজে ও অল্প সময়ে লিখতে, শিখতে ও বলতে পারে সে-ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হওয়ার অধিকার রাখে। আর এ না-করলে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীশক্তি যেমন জনগণের মত না নিয়ে, নিজের সুবিধা অনুযায়ী, ইংরেজিকে জোর করে ভারতবর্ষের অধিবাসীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল– শুধু উর্দু বা বাংলা নিখিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হলে ঠিক সেই সাম্রাজ্যবাদী অযৌক্তিক নীতিরই অনুসরণ করা ছাড়া অন্যকিছু হবে না, কিন্তু এরকম অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক প্রচেষ্টাই পাকিস্তানি শাসক ও বুদ্ধিজীবী মহলে দেখা দিয়েছে, যা সত্যিই লজ্জাকর ও দুর্বল-মনের অভিব্যক্তি (inferiority complex)। শাসক ও বুদ্ধিজীবী মহলপাকিস্তানি জাতীয়তার ভিত্তি উর্দু ভাষাকে প্রচার করছে, আর উর্দুকে পাকিস্তানি জাতীয়বাদের প্রেরণা-উদ্দীপক শক্তি হিশেবে চিহ্নিত করে উর্দুকে পূর্ব-বাংলা ও পশ্চিম-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে অধ্যাপক আবুল কাশেম প্রত্যেক বাঙালিকে সর্বপ্রকার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন,

- প্রত্যেক স্কুলে, কলেজে, এবং প্রত্যেক সহরে সভা করে অপর ভাষাকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করে কায়েদে আজম ও অন্যান্য নেতাদের নিকট পাঠাতে হবে।
- গণ-পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের নিকট ডেপুটেশন গিয়ে তাঁরা যেন বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে মত দিয়ে বাঙ্গালীর আত্মহত্যার পথ সুগম না করেন তা স্পষ্ট করে বুঝাতে হবে।[১৭]

অধ্যাপক আবুল কাশেম আরও বলেন, 'কায়েদে আজম জিন্না প্রত্যেক প্রদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন। এমন কি– লাহোর প্রস্তাবেও পাকিস্তানের প্রত্যেক ইউনিটকে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক ইউনিটকে তাদের স্ব স্ব প্রাদেশিক রাষ্ট্র ভাষা কি হবে তা নির্দ্ধারণ করবার স্বাধীনতা দিতে হবে।'[১৮]

ড. কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর 'রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা-সমস্যা'- শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, 'কোনো দেশের লোকে যে ভাষায় কথা বলে, সেইটিই সে দেশের স্বাভাবিক ভাষা। প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে আবার পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা সমন্ধে সমস্যা উঠে কি করে? সত্য সত্য এইটেই মজার কথা– যা স্বাভাবিক, তা অনেক সময় জটিল বুদ্ধি দিয়ে সহজে বোঝা যায় না। একটু পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করছি। ধরে নেওয়া যাক, কোনো দেশের শতকরা ৯৯ জন বাংলা ভাষায়, আর বাকি ১জন মাত্র ইংরেজী, উর্দূ, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় কথা বলে। আরও মনে করা যাক, এই শেষোক্ত ব্যক্তিরা বাণিজ্যসূত্রে বা শাসক-হিসাবে সে দেশে গিয়ে প্রতিষ্ঠাবান হয়েছে এবং অল্প শিক্ষিত বা অল্প বিত্তশালীদের উপর প্রভুত্ব চালাচ্ছে। তাই এরা সে দেশের লোকের প্রতি ও তার ভাষার প্রতি স্বভাতঃই অশ্রদ্ধাবান। সে দেশের ভাষা শিক্ষা করে তাদের সঙ্গে কাই-কারবার করা এরা অনাবশ্যক শক্তি-ক্ষয় বলে মনে করে, আর তা এদের আত্ম-সম্মানেও আঘাত করে বৈ কি! অবশ্য, বিজিত জাতি বা শোষিত অধমর্ণের আত্ম-সম্মান থাকে না, আর তা শোভাও পায় না। বিশেষতঃ বিজেতা বা উত্তমর্ণের ভাষা শিক্ষা করে তাদের সঙ্গে দহরম মহরম রাখতে পারলে তাদের সন্তুষ্টি সাধন করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবিকা অর্জনের পথও প্রশস্ত হয়। আরও প্রধান কথা, এইভাবে দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে নিজেদের বিরাট পার্থক্য সংরক্ষণ ও

[১৬] অধ্যাপক আবুল কাশেম, 'আমাদের প্রস্তাব', পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭।
[১৭] অধ্যাপক আবুল কাশেম, 'আমাদের প্রস্তাব', পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা 'বাংলা না উর্দু?, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭।
[১৮] অধ্যাপক আবুল কাশেম, 'আমাদের প্রস্তাব', পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা 'বাংলা না উর্দু?, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭।

স্মরণ করে যথেষ্ট মর্য্যাদা অনুভব করা যায়। বিজেতা উত্তমর্ণের অনুগ্রীহিত এই সৌভাগ্যবানেরাই দেশের নেতা এবং জনগণের নামে সমুদয় সুবিধা ভোগের অধিকারী। বর্তমানের সমাজ ব্যবস্থায় ইহা স্বাভাবিক, কারণ 'মুঢ়-মূকদের' বঞ্চিত করায় ভয়ের কারণ নেই বরং না করা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র। এই হল মোটামুটি বাংলাদেশের এবং বিশেষ করে বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা সমস্যার মানসিক পটভূমি।'[১৯] তিনি তাঁর প্রবন্ধে আরও বলেন যে, মোগল-পাঠান নৃপতিরাই বাংলা ভাষাকে পুষ্ট করেছিলেন। মোগলপাঠানেরা মূলে বিদেশী হলেও বাংলাদেশকেই তারা স্বদেশ করেছিলেন। পাঠান রাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ ও মহাভারত সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়। ভগবত এবং পুরাণাদিও রচিত হয়। বাঙালির কৃষ্টি-ঐতিহ্যের ধারা রক্ষার ক্ষেত্রে এবং বাঙালির নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্টের আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এসব গ্রন্থের তুলনা হয় না। **তারপর তিনি বলেন,** 'কিছুদিন পরে, ইংরাজী হ'ল রাষ্ট্রভাষা। হিন্দুরা সানন্দে নতুন প্রভু ও তার ভাষাকে বরণ করে নিল, কিন্তু মুসলমানেরা নানা কারণে তা' পারল না। রামমোহনের যুগেও তার উক্তি থেকেই আমরা জানতে পারি, হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মধ্যে তুলনায় মুসলমানই ভদ্রতার বিচারবুদ্ধিতে এবং কার্য্যপরিচালনায় শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই উপরোক্ত কারণ এবং রাজকীয় ভেদনীতির ফলে আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক সমুদয় ব্যাপারে মুসলমান তলায় পড়ে গেল এবং হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মনে পরস্পরের প্রতি বিজাতীয় ঘৃনা ও হিংসার সৃষ্টি হল। বাংলা ভাষাও দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ল। উচ্চ-শিক্ষিত পণ্ডিতেরা একে সংস্কৃতের আওতায় নিয়ে কেবল হিন্দু সভ্যতার বাহন করে তুলল। আর মুসলিম অর্ধশিক্ষিত মুন্সিরা আরবী পার্সী বহুল একপ্রকার ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি করল। দুইদিকেই বাড়াবাড়ি হল। কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার জোরে পণ্ডিতি বাংলা টিকে গেল, মূন্সীয়ানা বাংলা প্রায় লুপ্ত হল। অবশ্য বর্তমান গণ-প্রাণধান্যের যুগে ক্রমে ক্রমে পণ্ডিতি বাংলা সরল হয়েছে।'[২০] তারপর তিনি বলেন যে, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর বিপর্যয়, ১৮৩০-৪০ খ্রিস্টাব্দের ওহাবী আন্দোলনের ব্যর্থতা, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের শোচণীয় পরিণাম সব গ্লানিকে সার্থক করে ইংরেজ প্রভুত্বের অবসান ঘটে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মুসলমান জন সাধারণ ও নেতৃবৃন্দের সামনে বিরাট কর্তব্য ও গুরুদায়িত্ব উপস্থিত হয়। সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালির সমবেত চেষ্টায় অগ্রসর হতে পারলে দেশের দারিদ্র, স্বাস্থ্যহীনতা, অশিক্ষা এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করে পূর্ব-বাংলা আবার গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারবে। ড. কাজী মোতাহার হোসেন, এ-প্রবন্ধে বাংলা ও সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা প্রসঙ্গে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্মীদের ইতিকর্তব্য নির্দেশ করে বলেন, দারিদ্র দূর করতে হলে সামাজিক বৈষম্য দূর, বৈদেশিক শোষণ থেকে আত্মরক্ষা এবং জাতীয় সম্পদ যাই থাক শিল্পবাণিজ্যের সাহায্যে তার সুবিনিময়ের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। তিনি আরও বলেন যে, শুধু প্রভাব কিছুটা খর্ব করলেই চলবে না– ইংরেজের বদলে যেন বৈদেশিক বা অন্য প্রদেশীয় লোক সে-স্থান দখল করতে না পারে সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। কুচক্রি মানুষ যাতে শিক্ষাব্যবস্থার ভিতর দিয়ে, ভাষার বাধা সৃষ্টি করে নানা অজুহাতে পূর্ব-বাংলার 'মানসিক বিকাশে বাধা না জমাতে পারে সে বিষয়ে নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণকে সজাগ থাকতে হবে'। বাঙালি মুসলমানের অধঃপতণের কারণ বলে তিনি উল্লেখ করেন মাতৃভাষার প্রতি উদাসীনতা। এরসঙ্গে তিনি যোগ করেন যে, উর্দুর পক্ষে যতই ওকালতি করা হোক না কেন, ' নানা দেশীয় সৈনিকের তৈরি একটি খিচুড়ী ভাষা' উর্দু আসলেই পরকীয় ভাষা। মাতৃভাষাকে পুষ্ট এবং রাষ্ট্রকে গৌরবান্বিত করার দায়িত্ব বাঙালির উপর। তাঁর কথা অনুযায়ী বাংলা ভাষার চর্চা ব্যতীত বাঙালি মুসলমানের অন্যকোনো উপায় নেই, তিনি আরও বলেন, 'এতদিন মুসলমান কেবল হিন্দুর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে ব'সে বলেছে যে হিন্দুরা বাংলা ভাষাকে হিন্দুয়ানী ভাবে ভরে দিয়েছে; কিন্তু পূর্ব-

[১৯] ড. কাজী মোতাহার হোসেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?, ঢাকা, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭।
[২০] ড. কাজী মোতাহার হোসেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?, ঢাকা, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭।

পাকিস্তানে তো তা চলবে না। এখানে ইসলামী ঐতিহ্য পরিবেশন করবার দায়িত্ব মুখ্যতঃ মুসলমান-সাহিত্যিকদেরই বহন করতে হবে। তাই আজ সময় এসেছে, মুসলমান বিদ্যজ্জন পুঁথি-সাহিত্যের স্থলবর্ত্তী বাংলা-সু-সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় স্থাপন করবেন; তবেই মাতৃভাষা সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ হবে' এবং ইসলামী ভাবধারা যথার্থ ভাবে জনসাধারণের প্রাণের সামগ্রী হয়ে তাদের দৈন্য ও হীনতা-বোধ দূর করবে। উর্দুর দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে আমাদের কোনো কালেই যথার্থ লাভ হবে না। আল্লাহর কাছে উর্দু বেশী আদরের কিম্বা বাংলা হতাদরের সামগ্রী নয়। উর্দু আরবী থেকে গৃহীত বলেই যে উর্দু ভাষা মুসলমানের ধর্ম্মীয় ভাষা একথাও যথার্থ নয়।'[২১] ড. কাজী মোতাহার হোসেন, এ-প্রবন্ধে, সুস্পষ্ট বলেছেন যে, তিনি উর্দু ভাষাকে নিন্দা বা অশ্রদ্ধা করেন না, তবে বাঙালির উর্দু-মোহকে সত্য-সত্যি মারাত্মক বলে মনে করেন। যখন তিনি দেখেন 'উর্দু ভাষায় একটি অশ্লীল প্রেমের গান শুনেও বাঙ্গালী সাধারণ ভদ্রলোক আল্লাহের মহিমা বর্ণিত হচ্ছে মনে করে ভাবে মাতোয়ারা, অথবা বাংলা ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীতও হারাম বলে নিন্দিত' তখন তিনি বুঝতে পারেন এসব 'অবোধ ভক্তি বা অবোধ নিন্দার প্রকৃত মূল্য' কিছুই নেই। ব্যাপারটি 'ধ্বনিজ মোহ' ব্যতীত অন্যকিছুই নয়। ভিন্ন ভাষা-ভাষীদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য তিনি অন্য ভাষায়ও শিক্ষাগ্রহণ করতে উপদেশ দেন; কিন্তু এ শিক্ষা 'মাতৃভাষার পরিপূর্ণ শিক্ষার পটভূমির উপর হওয়াই বাঞ্ছনীয়' বলে উল্লেখ করেন, কারণ মাতৃভাষার বিকল্প অন্য কিছুতেই থাকে না, তাই 'প্রাথমিক শিক্ষায় শুধু মাতৃভাষা, ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীর শেষ তিন চার বছর এরসঙ্গে প্রয়োজনমত অন্য একটি বা দুটি ভাষা' জুড়ে দেওয়া যায়। তিনি শিক্ষার বাহন হিশেবে মাতৃভাষার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেন, এবং পূর্ব-বাংলার রাজভাষা বা রাষ্ট্রভাষা বাংলাই হওয়া স্বাভাবিক এবং সমীচীন বলে উল্লেখ করেন। উর্দুকে 'শ্রেষ্ঠ ভাষা, ধর্মীয় ভাষা বা বনিয়াদি ভাষা' বলে চালানোর চেষ্টা করা অহমিকা। তিনি আরও প্রস্তাব করেন, ' নবজাগ্রত জনগণ আর মুষ্টিমেয় চালিয়াত বা তথাকথিত বনিয়াদি গোষ্টির চালাকীতে ভুলবে না। বরং পূর্ব পাকিস্তানে সরকারী চাকুরী করতে হ'লে প্রত্যেককে বাংলা ভাষায় মাধ্যমিক মান পর্য্যন্ত পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। অন্যথায় শিক্ষানবীশী সময়ের পরে অযোগ্য এবং জনসাধারণের সহিত সহানুভূতিহীন বলে এরূপ কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হবে।'[২২] পশ্চিমাঞ্চলে উর্দু বা পোস্ত রাষ্ট্রভাষা করার জন্য তিনি মতও প্রকাশ করেন। এরসঙ্গে তিনি যোগ করেন, 'জনগণ প্রমাণ করবে যে তারাই রাজা– উপাধিধারীদের জনশোষণ আর বেশী দিন চলবে না। বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের উপর রাষ্ট্রভাষা রূপে চালাবার চেষ্টা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধুমায়িত অসন্তোষ বেশী দিন চাপা থাকতে পারে না। শীঘ্রই তা'হলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হবার আশঙ্কা আছে। জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে ন্যায় সঙ্গত এবং সমগ্র রাষ্ট্রের উন্নতির সহায়ক নীতি ও ব্যবস্থা অবলম্বন করাই দূরদর্শী রাজনীতিকদের কর্ত্তব্য।'[২৩]

আবুল মনসুর আহমদ তাঁর 'বাংলা ভাষাই আমাদের রাষ্ট্রভাষা হইবে'-শীর্ষক ছোট প্রবন্ধে বাংলা ভাষার দাবী উপেক্ষিত হলে পূর্ব-বাংলার জনগণের জীবনে কীরকম অভিশাপ নেমে আসবে সে-সম্বন্ধে বাঙালিকে সতর্ক করে দেন, তিনি বলেন,

> ঢাকা তমদ্দুন মজলিসের তরফ হইতে বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিবার যে চেষ্টা হইতেছে, সে চেষ্টায় আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। আমি অন্যান্য কারণের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণসমূহে বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে চাই–
> (১) জনগণের ভাষা ও রাষ্ট্রের ভাষা এক না হইলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে না।

[২১] ড. কাজী মোতাহার হোসেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?, ঢাকা, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭।
[২২] ড. কাজী মোতাহার হোসেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?, ঢাকা, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭।
[২৩] ড. কাজী মোতাহার হোসেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?, ঢাকা, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭।

(২) উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি "অশিক্ষিত" ও সরকারি চাকুরীর "অযোগ্য" বনিয়া যাইবেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফারসীর জায়গায় ইংরাজীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্রবাদ মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি "অশিক্ষিত" ও সরকারি কাজের "অযোগ্য" করিয়াছিল।

(৩) উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলেও বাংলাকেই শিক্ষার মেডিয়াম রাখা হইবে বলিয়া যে প্রচার করা হইতেছে, উহা কার্যতঃ ভাওতা ও রাজনৈতিক প্রবঞ্চনায় পরিণত হইবে; কারণ জীবনের সকল ক্ষেত্রের 'যোগ্যতার' মাপকাঠি হইবে রাষ্ট্রভাষার জ্ঞানের বিস্তৃতি ও গভীরতা।

(৪) উর্দু বাংলার চেয়ে সহজ বলিয়া যে কথা বলা হইতেছে উহা প্রচারণা মাত্র। প্রকৃত পক্ষে উর্দূ বাংলার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন।

(৫) উর্দুর সুপ্রচলিত ও সুদৃশ্য লাখ্‌নৌভী হরফের ছাপা, মুদ্রণ, টাইপরাইটিং প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক কাজের অনুপযোগী। কলিকাতা ও মিসরী হরফ ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ ও কষ্টে শিক্ষণীয়। উভয় ছাপারই হরফের রূপান্তর বড় বেশী জটীল।

(৬) বাংলা-ভাষা সংস্কৃত-ঘেষা ও হিন্দু-প্রভাব-পূর্ণ, এ অভিযোগ ভ্রান্ত। বাংলা ভাষা মুসলিম কৃষ্টির উপযোগী নয়, এ অভিযোগও ঠিক নয়। আমরা যে বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে চাই, সেটা "ব্যাকরণ মঞ্জুষার" বঙ্গভাষা নয়, জনগণের মুখের বাংলা জবান।

(৭) হরফ সম্বন্ধে আমাদের কোনো গোঁড়ামি নাই। বিজ্ঞানের নিক্তিতে ওজন করিলে যদি বাংলা হরফ অযোগ্য প্রমাণ হয়, এবং সম্ভাব্য রদ-বদলেও যদি উহা যথেষ্ট যোগ্যতা লাভ না করে, তবে আমরা রোমান হরফ নিতে রাজী আছি। উর্দু-ওয়ালারাও যদি আরবী বদলে রোমান হরফ নিতে রাজী হন, তবে উর্দুর পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তিই খসিয়া পড়ে। কারণ আরবী হরফে লেখা হয়, এটাই উর্দুর পক্ষে মুসলিম-গণ-মনে সবচেয়ে বড় আবেদন।[২৪]

আবুল মনসুর আহমদ দৃঢ়কণ্ঠে প্রকাশ করেন যে, গণপরিষদে যদি উর্দু-বাংলার যোগ্যতার ও দাবীর বিচার ওঠে, তবে সেখানে বাংলা ভাষার পক্ষে ওকালতি যাতে যোগ্য ও যথেষ্ট হয়, তার চেষ্টা প্রধানত পূর্ব-বাংলার ছাত্রদেরই করতে হবে, কারণ পূর্ব-বাংলার 'ইনটেলিজেন্‌শিয়া' হিশেবে তাদের দায়িত্ব অপরিসীম।[২৫]

গণ-আজাদী লীগ ও তমদ্দুন মজলিস

'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে?' এ-নিয়ে যখন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে তর্কবিতর্ক প্রকাশ হতে থাকে তখন সাংগঠনিকভাবে বাংলার বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের (বিশেষ করে তাজুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহ, অলি আহাদ প্রমুখ) দ্বারা বাংলা ভাষার দাবীতে, রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ও বাঙালির মধ্যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি আনয়ন করে রাষ্ট্রকে সুন্দরভাবে তৈরি করার উদ্দেশ্যে, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে, ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'গণ-আজাদী লীগ'। প্রতিষ্ঠানের প্রধান নেতা ও আহবায়ক হিশেবে মনোনীত হন কমরুদ্দীন আহমদ। 'গণ-আজাদী লীগ' স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করে যে, দেশের স্বাধীনতা আর জনগণের স্বাধীনতা এক নয়, বরং দুটি পৃথক সত্ত্বা। বিদেশী-শাসন থেকে একটি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করা মানেই নয় দেশবাসী অর্থনৈতিকভাবে মুক্তি পেয়েছে; রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোনো মূল্যই থাকে না যদি দেশের জনগণ অর্থনৈতিকভাবে সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতা লাভ করে, আর অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতীত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি করা অসম্ভব। শিক্ষার মাধ্যম ও মাতৃভাষার অধিকার প্রসঙ্গে 'গণ-আজাদী লীগ' সরকারের কাছে দাবী জানান, 'মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করতে হবে' এবং 'মাতৃভাষা বাংলাকে দেশের যথোপযোগী করার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নিতে হবে'। 'গণ-

[২৪] আবুল মনসুর আহমদ, 'বাংলা ভাষাই আমাদের রাষ্ট্রভাষা হইবে ', ১৯৪৭।

[২৫] আবুল মনসুর আহমদ, 'বাংলা ভাষাই আমাদের রাষ্ট্রভাষা হইবে', ঢাকা, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭।

আজাদী লীগ' মনপ্রাণে বিশ্বাস করে যে, বাংলা ভাষা হবে পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্রভাষা।[২৬] 'গণ-আজাদী লীগ'-এর ইশতেহারে এও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পূর্ব-বাংলা সম্পূর্ণ-স্বাধীন একটি রাষ্ট্র হবে, যার সঙ্গে পাকিস্তান-নামক রাষ্ট্রের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে 'গণ-আজাদী লীগ' পরিবর্তিত হয় 'সিভিল লিবার্টিস লীগ'-এ।[২৭]

অন্যদিকে সচেতন শিক্ষিত সমাজের সদস্যবৃন্দের মাঝে ১৯৪৭-এর মধ্যেই রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন শুরু হয়ে যায়, বাংলা ভাষাকে নিখিল পাকিস্তানের 'রাষ্ট্রভাষা' করার উদ্দেশ্যে, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭, অধ্যাপক ও ছাত্রদের সম্মিলিত উদ্যোগে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক 'তমদ্দুন মজলিস'-নামক একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। সচেতন বাঙালি মাতৃভাষার প্রশ্নে আপোষহীন ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন বলেই তারা বাংলা ভাষার পক্ষে দৃঢ়কণ্ঠে মন্তব্য প্রকাশ করতে তারা যুক্তির ভিত্তিতে গড়ে তুলেন রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন। তাদের অবদানেই বাঙালি-সংস্কৃতি ও পাকিস্তানি-সংস্কৃতির মধ্যে বিরাজমান স্বতন্ত্ররেখাগুলি প্রখরভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, স্বাভাবিকভাবেই এগুলি প্রতিযোগিতা মুখর ও বিকাশমান হতে থাকে। শুরু হয় পাকিস্তানি-সংস্কৃতি ও বাঙালি-সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্ম-বিশ্বাস ও ঐতিহ্য নিয়ে চিরজন্মের বিরোধ।

কর্মীসম্মেলন ও গণতান্ত্রিক যুবলীগ

'ধর্মভিত্তিক' পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই, আগস্ট মাসে আতাউর রহমান, কাজী মুহম্মদ ইদরিস, শহীদুল্লাহ কায়সার, আখলাকুর রহমান, একরামুল হক, আবদুর রশীদ খান প্রমুখ নেতাকর্মীরা পূর্ব-বাংলায় তাদের কর্তব্য ও কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য কলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোটেলে সম্মিলিত হন। তাদের মধ্য থেকেই কয়েকজন ঢাকায় এসে পূর্ব-বাংলার নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে আলাপালোচনা করে রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য একটি কর্মীসম্মেলনের তারিখ (২৪শে আগস্ট ১৯৪৭) ধার্য করেন, কিন্তু নানা সমস্যা ও অসুবিধার কারণে পূর্ব-বাংলা কর্মীসম্মেলনটি ৬-৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৪৭) ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনটি ছিল প্রতিনিধি সম্মেলন ও দ্বিতীয় দিনটি ছিল প্রকাশ্য অধিবেশন। এ-সম্মেলন থেকেই গঠিত হয় পূর্ব-বাংলা 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ', যার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ণ ব্যক্তি-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করা এবং 'পাকিস্তান'কে স্বাধীন-সুখী-সমৃদ্ধশালী একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিশেবে গড়ে তোলা। কর্মীসম্মেলনে শাহ আবদুল বারী (বগুড়া) কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়, এতে বলা হয়,

১. পাকিস্তান সরকারকে ঘোষণা করিতে হইবে যে, পূর্ব-পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

২. (ক) যথাক্রমে ১৮ ও ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক বালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাইমারী ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে।

(খ) আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলির মধ্য দিয়া অর্থকরি বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩. মিল ও কারখানা প্রভৃতিতে যে সমস্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া পেটের দায়ে বাধ্য হইয়া কাজ করিতেছে তাহাদিগের প্রতি পাকিস্তান সরকারকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন মিল এবং কারখানার মালিকগণ সেই সব বালক-বালিকাদিগকে সম্পূর্ণ ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

৪. (ক) ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করিয়া দিয়া ভিক্ষুক নিবাস নির্মাণ করিয়া তথায় ভিক্ষুক ও অসহায়দিগকে উপযুক্ত কার্যে নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করেন।

[২৬] আশু দাবি কর্মসূচী, প্রকাশক– কমরুদ্দীন আহমদ, পূর্ব-পাকিস্তান পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, জুলাই ১৯৪৭।
[২৭] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব-বাঙালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১৯৭০।

(খ) সে সমস্ত লোক অকর্মণ্য শিথিল বা পঙ্গু তাহাদের খাওয়া পরার সমস্ত দায়িত্ব সরকারকেই বহন করিতে হইবে।

৫. প্রাইমারী শিক্ষকগণের মাহিয়ানা ৬০ টাকার কম হইবে না।

৬. গত ২০ বৎসর হইতে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত ছাত্র কলিকাতা ইউনিভারসিটিতে প্রত্যেক পরীক্ষায় যে যে সাবজেক্টে ফেল করিয়াছে শুধু সেই সেই বিষয়ের পরীক্ষা তাহাদিগের লওয়া হউক।

৭. (ক) বিনা খেসারতে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই পাকিস্তান সরকারকে জমিদারী প্রথা উঠাইয়া দিতে হইবে।

(খ) ভূমিহীনদিগের মধ্যে জমি বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) জমিদারী প্রথা উঠাইয়া দিয়া বাকি আবওয়াব হইতে কৃষকগণকে রেহাই দিতে হইবে।

(ঘ) কোনো পরিবার মাথা পিছু বিঘা এবং উর্ধপক্ষে ৯০ বিঘার উপর জমি রাখিতে পারিবে না।

৮. পাকিস্তান সরকারকে প্রতি পূর্ণবয়স্ক লোকের জন্য গড়ে মাথা পিছু মুদ্রার বর্তমান মূল্য দৈনিক দুই টাকা আয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯. (ক) পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসন পরিচালক কর্মচারীগণের বেতন অর্থনৈতিক নীতির উপর ভিত্তি করিয়া এমনভাবে নিরূপণ করিতে হইবে যাহাতে জাতিগত অর্থের অপচয় বা স্থল বিশেষে অপ্রাচুর্যের হেতু মনুষত্বের অবমাননা না হয়।

(খ) অনুরূপ অর্থনৈতিক নীতির উপর ভিত্তি করিয়া শাসন পরিষদের সভ্যগণের ভাতা নির্ণয় করিতে হইবে।

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর যাতায়াত ভাড়া এম. এল. এ.-গণের জন্য নির্ধারিত করিতে হইবে।

(ঘ) আইন পরিষদের সকল সভ্যগণের মাহিয়ানা সমান ইহবে, কেবল মাত্র যাঁহারা মন্ত্রী হইবেন তাঁহাদের জন্য সরকারী গাড়ী, বাড়ী ও আরদালীর পৃথক ব্যবস্থা থাকিবে।

১০. যোগ্যতা নিরূপণ করিয়াই চাকুরীজীবিদিগকে বহাল করিতে হইবে। কোন দল বিশেষের চাপে অযোগ্য লোককে যেন বড় বড় চাকুরী না দেওয়া হয়।

১১. পাকিস্তান সরকারকে ঘোষণা করিতে হইবে যে সমস্ত মুসলমান পাকিস্তান কায়েম হওয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া আসিতেছেন তাঁহারা যদি এখনও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে তাঁহাদের প্রতি কঠোর শাস্তির বিধান করিতে হইবে।

১২. যানবাহন (যেমন রেল, ষ্টিমার, ট্রাক, বাস ইত্যাদির) গুলির ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণী উঠাইয়া দিয়া গদীযুক্ত সীটের বন্দোবস্ত ও তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া আদায়ের ব্যবস্থা করণ।

১৩. বড় বড় ফ্যাক্টরী, মিল, কলকারখানা ও যানবাহনের এমনকি এক লক্ষ টাকার আয়ের উপরের সমস্ত সম্পত্তি যথা ব্যবসা বাণিজ্য অথবা অন্যকোন উপায়ে উপার্জ্জিত অর্থ যে উপায়েই আয় করা হউক না কেন, ইহা জনসাধারণের সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে।

১৪. মহাযুদ্ধের আওতায় যে সমস্ত লোকের সম্পত্তি অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং যেখানে অন্য উপায় অবলম্বনীর দরুণ এই সম্পত্তি বৃদ্ধির কারণ বলিয়া সন্দেহ হইবে সে সমস্ত সম্পত্তি অবিলম্বে বাজেয়াপ্ত করিয়া রাষ্ট্রের অন্তরর্ভুক্ত করিতে হইবে। এক কথায় চোরাকারবারীদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী ও বেসরকারী লোক লইয়া সরকারকে অবিলম্বে এমনভাবে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করিতে হইবে যাহার ফলে ঐ সমস্ত চোরাকারবারীদের সমস্ত সম্পত্তির আয় ব্যয়ের সঠিক হিসাব লইয়া যুদ্ধের পূর্বে যে আয় ছিল তাহা হইতে যে অংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবিদের উপর ইহা প্রযোজন্য হইবে।

১৫. পাকিস্তান রাষ্ট্রের নদীগুলির পানি নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করিতে হইবে। এবং সমস্ত দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া নদ-নদী, খাল-বিল, বন-ভূমি, নালা-ডোবা, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদির সংস্কার ও নির্মাণ করত সর্বত্র ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা করতে হইবে।

১৬. পূর্ব-পাকিস্তান রাষ্ট্রে আরও তিন চারটি বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ ও কৃষি কলেজ স্থাপন করিতে হইবে।

১৭. প্রাপ্তবয়স্ক নর ও নারী মাত্রই বিনা ট্যাক্সে ভোটাধিকার থাকিবে।

১৮. আধুনিক স্বাস্থ্য নীতি অনুসারে জনগণের বাসস্থান এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে জাতির স্বাস্থোন্নতি হয় ও দেশের আবাদি ও উর্বরি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

১৯. ঈদল ফেতরের ও ঈদোজ্জোহার ফেতরা বা যাকাত ইত্যাদি পাকিস্তান রাষ্ট্রে জমা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে ও একটি সরকারী বয়তুলমাল তহবিল গঠন করিতে হইবে।

২০. রাষ্ট্রের খরচে প্রত্যেক ইউনিয়নে ফ্রি-হাসপাতাল স্থাপন করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২১. (ক) পাট, খনি, চা ইত্যাদি শিল্পগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে।

(খ) অর্ন্তবর্তী সময়ে পাটের সর্বনিম্ন মূল্য ৩৫, ৩৮ ও ৪০ টাকার কম হইবে না।

(গ) জুট সেল-সাপ্লাই সমিতি গঠন করিয়া সরকারকে অবিলম্বে পাট গুদামজাত করিতে হইবে ও বিক্রিত লভ্যাংশের কতক পরিমাণ উৎপাদনকারীকে ও বাকি অংশ গঠনমূলক কাজে ব্যয় করিতে হইবে।

২২. মাতৃভাষা হইবে আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা, তবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যোগাযোগের ভাষা উর্দ্দু হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

২৩. যে সমস্ত কার্যে জাতীয় জীবনের অবনতি ঘটিতে পারে সেই সমস্ত অপকার্যের জন্য ইসলামী আইন অনুসারে দণ্ডের ব্যবস্থা চালু করা হউক, যেমন চোরের হাত কাটিয়া দেওয়া, মিথ্যাবাদীর জিহ্বা কাটিয়া দেওয়া ইত্যাদি।

২৪. পূর্ব-পাকিস্তানের বাহিরের কোন ব্যক্তিকে পূর্ব-পাকিস্তানের কোন সরকারী চাকুরিতে রাখা চলিবে না।

২৫. প্রত্যেকটি ইউনিয়নে একটি করিয়া চিকিৎসাকেন্দ্র ও হাইস্কুল স্থাপন করিতে হইবে।[২৮]

অন্যদিকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানিয়ে, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৪৭, পূর্ব-বাংলার সাংবাদিক সংঘের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়,

> বাংলা ভাষা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্পদশালী ভাষা এবং বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের প্রায় ৮ কোটি লোক বাংলা ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ইহার বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়া ইহাকে বর্তমান স্ত রে উন্নীত করিয়াছে।
>
> পশ্চিম-বঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নমেন্টদ্বয় উভয়েই যদি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিশেবে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উহার ভবিষ্যৎ আরো উজ্জ্বলতর হইবে।
>
> হিন্দুরা যেমন সংস্কৃত, হিন্দি অথবা অন্যান্য ভাষার চর্চা করিবে, পূর্ব-পাকিস্তানবাসীরাও তেমনি পশ্চিম-পাকিস্তান ও অন্যান্য মোসলেম রাষ্ট্রের সহিত রাজনৈতিক অথবা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষা শিক্ষা করিবে। সুতরাং পূর্ব-পাকিস্তান গভর্নমেন্টকে ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত অনুরোধ করা যাইতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার বাহন বলিয়া যেন অতিসত্ত্বর ঘোষণা করা হয়।[২৯]

বাঙালি কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী-আইনজীবী, শিল্পী-কারিগর, অধ্যাপক-ছাত্র, পরিষদসদস্যসহ অনেকেই স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করে বাংলা ভাষার পক্ষে প্রচারান্দোলনে শরিক হন।[৩০] পরে বাংলা ভাষার পক্ষে প্রচারান্দোলন এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে 'তমদ্দুন মজলিস'-এর সম্পাদক অধ্যাপক এম. এ. কাশেম ও নেতা এস. আহসান পূর্ব-বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ স্মারকলিপিটি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

[২৮] প্রচার পুস্তিকা, পূর্ব-পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনে শাহ আবদুল বারী সাহেব (বগুড়া) কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবাবলী, ৬ই-৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭।
[২৯] বশীর আল্‌হেলাল, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৮৫।
[৩০] দৈনিক আজাদ, ১৮ই নভেম্বর ১৯৪৭।

আলোচনাকালে খাজা নাজিমুদ্দীন বলেন যে, পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা ঠিক করা পাকিস্তান গণপরিষদের কর্তব্য। প্রতিনিধিগণ যুক্তপ্রদেশ এবং পশ্চিম-বঙ্গের উদাহরণ উল্লেখ করে বলেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে পূর্ব-বাংলাকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। খাজা নাজিমুদ্দীন ব্যাপারটি বিবেচনা করে দেখার প্রতিশ্রুতি দেন।[৩১]

পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষাসম্মেলন

পূর্ব-বাংলায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রচারান্দোলন যখন তুঙ্গগে তখন করাচিতে অনুষ্ঠিত হয় নিখিল পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষাসম্মেলন (২৭শে নভেম্বর–১লা ডিসেম্বর ১৯৪৭)। নিখিল পাকিস্তান শিক্ষাসম্মেলনের উদ্বোধনীভাষণে অভ্যন্তরীণ, তথ্য-প্রচার ও শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ করে বলেন,

> The language problem has long buffed our educationists for with the ecceptin of Russia it is more complex in India than in any other country. In seeking a practical solution we will do well to study the Russian experimentation in this as in many other fields of education. With as many as 2,000 groups of distinct nationality ranging from the highly civilised to tribes still in the primitive stage of devil-worship and with 200 languages and dialects some of which did not even have a written alphabet, to deal with, Russian statemen and educationists had certainly a Herculean task to perform, but it is a tribute to their political sagacity that instead of forcing different national groups into narrow Russian cultural mould they have all such languages the medium of instruction as have showed some evidence of culture, of capacity to grow into a creative tool and to express thought processes. Today education in Soviet Russia is carried in no less than ninety languages. I commend the Russian example to you because it shows how diversity has been encouraged without endangering the fundamental unity of common culture, which has been ensured by making of Russian as the first compulsory foreign language in all non-Russian school. We may not subscribe to the Russian ideology but we can certainly benefit from their handling of the linguistic problem. We in Pakistan must provide the maxium scope for growth to our provincial languages not merely as media of instruction but also as instruments for the dissemination of the culture they embody without at the same time sacrificing the unity of our common culture. To ensure this unity, we need a language for interprovincial communication and in this counexion the claims of Urdu call for special consideration. It is the special creation of Muslims in India and during the comparatively brief period of its existance it has shown an extraordinary vitality and sensitivity both as an instrument of communication and as a vehical for the expression of the subtlest shades of thought and the most ethereal flights of fancy. The facility with which it can borrow and assimil\te words from foreign language, its historic affiliations with Persian, Arabic, Sanskrit and English and its high creative output in prose and poetry constitue to my mind unassailable grounds for its establishment as the 'lingua franca' of Pakistan.[32]

পাকিস্তানের শিক্ষাপদ্ধতি ইসলামিক আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তোলার স্বপ্নে অভ্যন্তরীণ, তথ্য-প্রচার ও শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করার জন্য উর্দুকে পাকিস্তানের লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষাসম্মেলনে পূর্ব-বাংলা থেকে আরও যোগদান করেন পূর্ব-বাংলার শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার, শিক্ষাসচিব ফজলে আহমদ করিম ফজলী, জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক কুদরত-ই-খুদা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাহমুদ হাসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হাকিম আলী ও অধ্যক্ষ পি. মাহশ্বেরী, প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ

[৩১] দৈনিক আজাদ, ১৫ই নভেম্বর ১৯৪৭।

[32] Extract from the Inaugural Address of Fazlur Rahman, Minister for Interior, Information & Broadcasting and Education, Pakistan Educational Conference, held at Karachi from November 27 to December 1, 1947, Proceedings 37-39.

হাকিম আলী এবং সিলেট কলেজের অধ্যক্ষ আই. এইচ. জুবেরী প্রমুখ। দুঃখের বিষয় যে, যেসব বাংলার নেতাদের উপর বাংলা ভাষার স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব বর্ষিত হয়েছিল, তাদের উপস্থিতেই গৃহীত হয়– উর্দুকে পাকিস্তানের লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা করার প্রস্তাব; এবং উর্দু ভাষার পক্ষে পাকিস্তানের শিক্ষামাধ্যম হিশেবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকমিটির ও যৌথকমিটির সিদ্ধান্তসমূহ। শিক্ষাসম্মেলনের প্রস্তাবাবলীতে বলা হয়,

> 1. An Advisory Board of Education for Pakistan be formed. The purpose of this Advisory Board would be to seek advice on all educational matters and to provide an effective link between the government and the public as far as education is concerned;
>
> 2. It was recommended to the Constituent Assembly by the Conference that Urdu should be recognised as the lingua franca of Pakistan;
>
> 3. Urdu must be taught as a compulsory language in schools;
>
> 4. The Educational System in Pakistan should be inspired by Islamic ideology, emphasising among many of its characteristics those of universal brotherhood, tolerance and justice;
>
> 5. Religious instructions should be made compulsory for Muslim students in schools and collages, and same facilities should be provided for other communities in respect of their religions;
>
> 6. Physical training should be made compulsory at the school stage, with special emphasis on activities such as scouting, military drill, mountaineering, swimming, etc. Provision of compulsory military training should be made in the universities and collages;
>
> 7. Students should be selected according to their aptitude, and should be advised to pursue the type of education for which they would be found suitable;
>
> 8. Efforts should be made in introducing literacy among masses;
>
> 9. Free and compulsory primary education should be introduced for a period of five years, which should be gradually raised to eight years;
>
> 10. It was resolved in the conference that universities be requested to consider the question of starting a University Officers Corps for Women and a University Nursing Training Corps;
>
> 11. A proposal for establishing a Council of Technical Education in Pakistan was recommended;
>
> 12. Education departments of provinces/ states were directed to have a comprehensive survey of possibilities of educational uplift of tribal people;
>
> 13. Contacts with foreign countries and their institutions should be established through Pakistan's Embassies and Universities, in order to ascertain the type of books, periodicals and other literature, which each country would like to take from Pakistan in exchange of their own literature and periodicals.[33]

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ক্ষমতা পূর্ব-বাংলার সরকারি-কর্মকর্তা বা সরকারি-শিক্ষাবিদদের না থাকলেও পূর্ব-বাংলার জনগণের ছিল; করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষাসম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে উর্দুকে পাকিস্তানের লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা হিশেবে নির্ধারণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলে 'মনিং নিউজ'-এ সংবাদ প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে 'শিক্ষাসম্মেলন'-এর সুপারিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি'র বৈঠক (৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৭, প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের বাসভবন 'বর্ধমান হাউস') চলাকালীন সময় অনুষ্ঠিত হয় ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ। বিক্ষোভ চলাকালে বিদ্রোহী ছাত্র-শিক্ষক-জনতার কণ্ঠে বাংলাকে অবিলম্বে রাষ্ট্রভাষা হিশেবে ঘোষণা করার

[33] Pakistan Educational Conference, held at Karachi from November 27 to December 1, 1947, Proceedings 37-39.

দাবী উচ্চারিত হতে থাকলে মওলানা আকরম খাঁ (ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি) বিদ্রোহী জনতাকে সম্মতিসূচক আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হবে।[৩৪] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের উদ্যোগে শিক্ষা-সম্মেলনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, ৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৭ (বেলা দুটোয়), একটি প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়, এতে সভাপতিত্ব করেন বিশ্বাবিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক আবুল কাশেম। রাষ্ট্রভাষার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই ছিল সর্বপ্রথম সাধারণ ছাত্রসভা।[৩৫] একইসঙ্গে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ফরিদ আহমদ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়; এতে বলা হয়,

১. বাংলাকে পাকিস্তান ডমিনিয়নের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-বাংলার সরকারি ভাষা ও শিক্ষার বাহন করা হোক;

২. রাষ্ট্রভাষা এবং লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা নিয়ে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল-সমস্যাকে ধামাচাপা দেওয়া এবং বাংলা ভাষা ও পূর্ব-বাংলার জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা;

৩. পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী ফজলুর রহমান এবং প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার উর্দু ভাষার দাবীকে সমর্থন করার জন্যে এ-সভা তাঁদের আচরণের তীব্র নিন্দা করছে;

৪. এ-সভা 'মনিং নিউজ'-এর বাঙালিবিরোধী প্রচারণার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করছে এবং জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্যে পত্রিকাটিকে সাবধান করে দিচ্ছে।[৩৬]

সর্বরকম সংশয় জলাঞ্জলি দিয়ে শিক্ষিতমহল বাংলা ভাষার সপক্ষে সুস্পষ্ট-বাস্তব-গণতান্ত্রিক দাবী উত্থাপন করে। সর্বপ্রথম সাধারণ ছাত্রসভা শেষে দুই সহস্রাধিক ছাত্রদের একটি শোভাযাত্রা পূর্ব-বাংলা সরকারের সচিবালয়ের সামনে সমাগত হয়। তারা 'উর্দুর জুলুম চলবে না', 'পাঞ্জাবি রাজ বরবাদ' প্রভৃতি শ্লোগানের মাধ্যমে পূর্ব-বাংলা সরকারের কাছে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিশেবে নির্ধারণ করার দাবী জানায়। শোভাযাত্রাটি কৃষিমন্ত্রী সৈয়দ আফজল, প্রাদেশিক-মন্ত্রী হামিদুল হক, প্রাদেশিক-মন্ত্রী নূরুল আমীন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার, প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন প্রমুখ নেতাদের বাসভনের সামনে উপস্থিত হয়ে নানারকম উর্দু-বিরোধী শ্লোগান দিতে থাকে।[৩৭]

প্রাদেশিক-মন্ত্রী নূরুল আমীন শোভাযাত্রী দলটির সামনে উপস্থিত হয়ে বলেন যে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে তিনি তার মতামত ব্যক্ত করেছেন। আর হামিদুল হক বলেন যে, পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্রভাষা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা উর্দু ভাষার নেই। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে অবশ্য কিছু সময়ের প্রয়োজন। যদি বর্তমান রাষ্ট্রভাষার পরিবর্তন অদূর ভবিষ্যতে করতেই হয়, তাহলে বাংলা ভাষাই এর স্থান অধিকার করবে। তিনি আরও বলেন যে, সমস্ত বিষয়টি ধীরস্থিরভাবে বিচার করতে হবে, অবশ্যি বিক্ষোভ সৃষ্টি করে নয়। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন অসুস্থ থাকায় তার রাজনৈতিক সেক্রেটারি মফিজুদ্দীন শোভাযাত্রী দলটির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সম্পর্কে তিনি ক্যাবিনেট ও পরিষদ সদস্যগণের সঙ্গে শীঘ্র আলোচনা করবেন।'[৩৮] তারপর শোভাযাত্রাটি 'মনিং নিউজ'-এর ঢাকা অফিসের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে 'মর্নিং নিউজ ধ্বংস হোক', 'উর্দুওয়ালা বরবাদ'– এরকম বিভিন্ন ধরনের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলতে থাকে। একসময় তারা 'মনিং নিউজ'-এর অফিস আমক্রণ

[৩৪] দৈনিক আজাদ, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪৭।
[৩৫] মনিং নিউজ, ৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৭।
[৩৬] মনিং নিউজ, ১০ই ডিসেম্বর ১৯৪৭।
[৩৭] দৈনিক আজাদ, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪৭।
[৩৮] দৈনিক আজাদ, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪৭।

করে। 'মর্নিং নিউজ' উর্দুকে পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে সমর্থন জানিয়ে এবং মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বাংলাকে সমর্থন করায় তাদের বিরুদ্ধে যে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে তার প্রতিবাদেই এরকম বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়।

পরে অবশ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলেন যে, শিক্ষাসম্মলনে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়নি। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে শিক্ষাসম্মেলনে কোনো সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়নি। লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা সম্বন্ধে মত বিনিময়ের জন্যে উর্দুকে একটি সাধারণ ভাষা বোঝানো হয়েছিল মাত্র। রাষ্ট্রভাষা বা শিক্ষার মাধ্যমের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।[৩৯] অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ, তথ্য-প্রচার ও শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান বলেন যে, শুধু শিক্ষার মাধ্যম হিশেবেই নয়, যে-সংস্কৃতির বাহন তারা সে-সংস্কৃতির প্রসারের জন্যে পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষাগুলির সর্বোচ্চ বিকাশের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু সেটা করার সময় সাধারণ সংস্কৃতির ঐক্যকে বিসর্জন দেওয়া যায় না। এই ঐক্যকে রক্ষা করার জন্যে প্রয়োজন একটি আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা এবং সেক্ষেত্রে উর্দুর দাবীকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা কর্তব্য।[৪০] উর্দুকে পাকিস্তানের লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা হিশেবে স্বীকৃতি দেওয়া সম্বন্ধে তিনি বলেন,

> এই সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা হিশেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যে সংবিধান সভার কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। [...] উর্দুকে স্কুলে একটি বাধ্যতামূলক ভাষা হিশেবে শিক্ষা দেওয়া হোক, কিন্তু প্রাইমারি স্কুলের কোন পর্যায়ে উর্দু শিক্ষা শুরু হবে সে-বিষয়ে সিদ্ধান্তের ভার প্রাদেশিক সরকারের হাতে অর্পণ করা হোক। স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম কি হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্তও প্রাদেশিক সরকার গ্রহণ করবে।[৪১]

৭ই ডিসেম্বর ১৯৪৭, রেল-কর্মচারীর সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষের (বাঙালি) ও বিপক্ষের (উর্দুভাষী) লোকদের মধ্যে একটি প্রচণ্ড সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য ফজলুল হককে আহ্বান করা হলেও তিনি অবাঙালি কর্মচারীর আপত্তিতে সভাপতির আসন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি শুরু হলে একসময় অবাঙালি কর্মচারীদের সভাস্থল থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নূরুল হুদার সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়।[৪২] রেল-কর্মচারীর সভাটি সম্বন্ধে ঢাকার উর্দু ভাষাভাষীর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় যে, সভাটির পিছনে ছিল হিন্দুদের সঙ্গে মিলে ফজলুল হকের নেতৃত্বে একটি পাকিস্তানবিরোধী চক্রান্তের কারসাজী। এছাড়াও বাংলার মত একটি হিন্দু ভাষাকে উর্দুর পরিবর্তে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়। এসব প্রচারণার ফলে সেদিনই সিরাজউদ্দৌলা পার্কে ফজলুল হকের সভাপতিত্বে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উর্দুপন্থী কিছুসংখ্যক লোক ছাত্রদের উপর ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে সভাস্থলের কিছু চেয়ারে অগ্নিসংযোগসহ হাঙ্গামা সৃষ্টি করে।[৪৩]

৭ই ডিসেম্বর ১৯৪৭, পূর্ব-পাকিস্তান সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে 'পূর্ব-পাকিস্তান শিক্ষাসমস্যা' সম্বন্ধে আলোচনা করার লক্ষ্যে ঢাকার ছাত্ররা মাওলানা আকরাম খাঁ'র সভাপতিত্বে একটি সভার আয়োজন করে। এ-সভায় মাওলানা আকরাম খাঁ বলেন, 'উর্দুর সর্বাপেক্ষা অনিষ্ঠ করিতেছে উর্দুর নাদান দোস্ত। বাংলাদেশে উর্দু ও বাংলা লইয়া যে বিতণ্ডা চলিতেছে তাহার কোনোই অর্থ হয় না। বস্তুত বাংলাদেশের শিক্ষার বাহন বা অফিস আদালতের ভাষা বাংলা ছাড়া অন্যকোনো ভাষা হইতেই পারে না।'[৪৪] তিনি 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার মাধ্যমে আরও একটি বিবৃতি প্রচার করেন, এতে বলেন,

---

[৩৯] মর্নিং নিউজ, ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৪৭।
[৪০] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব-বাঙালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১৯৭০।
[৪১] মর্নিং নিউজ, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪৭।
[৪২] তাজুদ্দীন আহমদের ব্যক্তিগত ডায়েরি, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪৭।
[৪৩] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব-বাঙালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১৯৭০।
[৪৪] দৈনিক আজাদ, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৭।

পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষাকে উপলক্ষ করিয়া দেশে একটি অহেতুক উত্তেজনা সৃষ্টি করা হইতেছে দেখিয়া আমি বিশেষ দুঃখিত হইলাম। আমার মতে এই উত্তেজনার কোনোই সঙ্গত কারণ নাই। পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা না হইয়া উর্দু হইবে কোনো দলের কোনো মতের কোনো বাঙালি মুসলমান আজ পর্যন্ত এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন নাই, বরং সকলেই এক্ষেত্রে বাংলার দাবী সমর্থন করিতেছেন। আমার জ্ঞানবিশ্বাস মতে, কেন্দ্র হইতেও পূর্ব-পাকিস্তানের উপর কখনো কোনো প্রকারে এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রীয় ভাষা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র অধিকারী হইতেছেন পাকিস্তানের Constituent Assembly বা বিধানরচনা পরিষদ। এই পরিষদ যে কোনো অবস্থায় মোসলেম বঙ্গের অভিমতকে অগ্রাহ্য করিতে চাহিবেন এবং চাহিলেও করিতে পারিবেন, এরূপ আশঙ্কা করার বিন্দুমাত্র কারণও আমি দেখিতে পাইতেছি না। [...] কিন্তু, দুঃখের বিষয়, অহেতুক হইলেও একটি উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তাই পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমান জনসাধারণের খেদমতে এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে নিজের ব্যক্তিগত মতামত অতি সংক্ষেপে আরজ করিয়া দিতেছি।

১. রাষ্ট্রের জনগণের মাতৃভাষাই সেখানকার রাষ্ট্রীয় ভাষা হইবে, ইহাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক কথা। যেহেতু পূর্ব-পাকিস্তানের গণভাষা অবিসম্বাদিতরূপে বাংলা, অতএব তাহার রাষ্ট্রীয় ভাষাও নিশ্চিতরূপে বাংলাই হওয়া চাই।

২. পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমান অধিবাসীদিগের শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হওয়াই সব হিশেবে সঙ্গত ও আবশ্যক। কিন্তু আরবি শিক্ষার অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হইতে পারিবে না।

৩. সাধারণ শিক্ষা ক্ষেত্রে উর্দুকে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমান শিক্ষার্থীদিগের জন্য একমাত্র ও বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষারূপে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উর্দুভাষার যে গুরুত্ব আছে, তাহা অস্বীকার করিলে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানরাই সবদিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

৪. মধ্যস্তর পর্যন্ত আরবি শিক্ষার্থীদিগের জন্য বাংলা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিয়া দিতে হইবে।

৫. এছলাম ধর্ম্ম ও মোসলেম সংস্কৃতির প্রতিকূল না হয়, তাহার মধ্যবর্তিতায় স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের মুসলমান জাতি যাহাতে মুসলমান শিক্ষার্থীদিগের পাঠ্যপুস্তকগুলি সেইভাবে রচনা করিয়া নিতে হইবে।

৬. বাঙালি ছাত্রদিগের পক্ষে সুপাঠ্য এ সহজসাধ্য হইতে পারে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উর্দু পাঠ্যপুস্ত কগুলি রচনা করিতে হইবে। ইহা দুঃসাধ্য ব্যাপার নহে।

৭. পুরাতন বা আধুনিক গোঁড়ামীর প্ররোচনায় ইংরেজিকে এখন বয়কট করিতে যাওয়া মোসলেম জাতি ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের পক্ষে একেবারেই সঙ্গত হইবে না।[৪৫]

বাঙালি-অবাঙালির সংঘর্ষ

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে যখন ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে তখন ঢাকায় শুরু হয় বাঙালি ও অবাঙালির মধ্যে হামলা ও দাঙ্গা। এরপর থেকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ, উর্দু-সমর্থক ও গুণ্ডাদের সহায়তায়, প্রকাশ্যে ভাষা-আন্দোলনের কর্মীবৃন্দের ওপর নির্যাতন, অত্যাচার ও হামলা চালিয়ে ও মিছিল-সভা করে উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানাতে থাকে।[৪৬] যেমন, ১২ই ডিসেম্বর ১৯৪৭, ঢাকার পলাশী ব্যারাক ও সচিবালয় এলাকায় বাংলা ও উর্দু ভাষার সমর্থকের মধ্যে একটি সংঘর্ষে ১৭জন আহত হয়।[৪৭] সংঘর্ষের উৎস ছিল উর্দু ভাষার পক্ষে প্রচার ও জনসভার আহ্বান। একটি লরি থেকে মাইকযোগে, ১৩ই ডিসেম্বরের অনুষ্ঠিতব্য চকবাজার মসজিদের সামনে একটি জনসভার সময়-স্থান এবং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানানোর প্রচারকার্যকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষের

[৪৫] দৈনিক আজাদ, ৮ই ডিসেম্বর ১৯৪৭।
[৪৬] আবুল কাসেম, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৬৭।
[৪৭] দৈনিক আজাদ, ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৪৭।

সূত্রপাত ঘটে। পুলিশরোপর্ট অনুযায়ী, সকাল ১০টার সময় চক অঞ্চল থেকে একটি লরি থেকে মাইকযোগে প্রচারকাজ শুরু হয়, এবং দুপুরের দিকে লরিটি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতে পৌঁছলে উর্দু ভাষার সমর্থকরা উর্দুর পক্ষে শ্লোগান দিতে থাকে; বাঙালি ছাত্ররা উর্দুর পক্ষে প্রচারণা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রচার না করার জন্য উর্দুপন্থীদের অনুরোধ জানায়, কিন্তু উর্দু ভাষার সমর্থকরা বাঙালি ছাত্রদের অনুরোধকে উপেক্ষা করে লরিটি নিয়ে অগ্রসর হয় পলাশী ব্যারকের পূর্ব-গেটে। এখানে ছাত্ররা লরিটিকে থামাতেই শুরু হয় তর্কবিতর্ক, বাকবিতণ্ডা– উর্দু না, বরং বাংলাই হবে রাষ্ট্রভাষা। লরিটি পলাশী ব্যারক পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার আধঘণ্টা পরে ইট-পাটকেল, লাঠি-সোটা, ছুরি-তলোয়ার বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র সংগ্রহ করে এবং আরও গুণ্ডাপাণ্ডাসহ পলাশী ব্যারাকে ফিরে আসে। উর্দু ভাষার সমর্থকরা বাঙালি ছাত্র ও সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এবং উর্দুকে পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে প্রবল শ্লোগান দিতে থাকে, তারা বলে, 'উর্দু হচ্ছে মুসলমানের ধর্মীয় ভাষা, যে এ-ভাষার বিরুদ্ধে কথা বলবে সে কাফের হিশেবে পরিগণিত হবে, এবং যেকোনো মূল্যে কাফেরকে শায়েস্তা করতেই হবে ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।' উর্দু ভাষার সমর্থকরা উত্তেজনামূলক শ্লোগান দিতে দিতে পলাশী ব্যারাকস্থ মেডিক্যাল হোস্টেল, আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং হোস্টেল প্রভৃতি ছাত্রাবাস আক্রমণ করে বাঙালি ছাত্রদের উপর ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে, কয়েক রাউন্ড গুলিও।[৪৮] আগুনের মত খবরটি ঢাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণ এ-গুণ্ডামি বন্ধ করার জন্যে পলাশী ব্যারাকে উপস্থিত হয়।[৪৯] শুধু সমাবেশই নয়, ঢাকার নাগরিকরা এর প্রতিকার করার দাবীতে একটি মিছিল বের করে সচিবালয়ের দিকে অগ্রসর হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ পেরিয়ে মিছিলটি প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী অবদুল হামিদের বাসভবনের সামনে উপস্থিত হলে লুঙ্গি পরা অবস্থায় শিক্ষামন্ত্রী অবদুল হামিদ সমবেত ছাত্র-জনতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গুণ্ডামির প্রতিকারের জন্যে তাঁর কাছে দাবী জানালে তিনি লুঙ্গি পরেই মিছিলের সঙ্গে সচিবালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মিছিলটি সচিবালয়ের ভিতর প্রবেশ করে সৈয়দ আফজলের অফিসের সামনে উপস্থিত হয়। সৈয়দ আফজাল দোতলা থেকে নীচে নেমে এসে ছাত্র ও জনতাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি বলেন যে, বাংলা ভাষা তিনিও চান, কাজেই জনতার সঙ্গে তার কোনো বিরোধ নেই।

১৬ই ডিসেম্বর, পূর্ব-বাংলা সরকার এক প্রেসবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলা ও উর্দু ভাষার সমর্থকদের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষটি স্বীকার করে, সরকার বলে যে, শুক্রবারে ঢাকা শহরে বাংলা ভাষার সমর্থক ও উর্দুর সমর্থক দুই শ্রেণীর মধ্যে একটি 'ছোটখাট দুর্ঘটনা' ঘটে। পূর্ব-বাংলা, পশ্চিম-পাকিস্তান ও ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ভেদসৃষ্টির নীতিরই অংশ হিশেবে অবাঙালি মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য কলকাতার কতিপয় সংবাদপত্র এ-ঘটনার সুযোগ গ্রহণ করেছে। আনন্দবাজার, ইত্তেহাদ, স্বাধীনতা– এসব পত্রিকা তাদের সম্পাদকীয় মন্তব্যে পূর্ব-বাংলায় উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে পূর্ব-বাংলার অবাঙালি মুসলমানদের ও অবাঙালি মুসলমান অফিসারদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেছে। পূর্ব-বাংলার মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য এবং শান্তিভঙ্গের জন্য এরকম উস্কানোমূলক প্রচারকার্য সরকার কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না।[৫০] সরকার ঘটে যাওয়া ঘটনার বিশেষ বিশেষ অংশগুলিকে মাটিচাপা দেওয়ার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রসঙ্গটি তীব্রভাবে প্রকাশ করে।

তবে বাঙালি জনসাধারণ বুঝতে পারে যে, জাতির সত্ত্বা তার ভাষার মধ্যেই নিহিত, তাই নিজের ভাষা যদি নিরুদ্ধ হয়ে যায় তাহলে একটি জাতির পক্ষে আত্মবিকাশের পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব না। বাঙালি সন্ধান করতে থাকে যে, পাকিস্তানি উপনিবেশবাদীর আগ্রাসনমূলক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কী?

[48] Government of East Bengal, B-Procedings, Bangladesh National Archives, Home Department, Police Brach, Procedings No 19-20.
[৪৯] ভাষার গোলযোগে দাঙ্গা, ঢাকা প্রকাশ, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৪৭।
[৫০] দৈনিক আজাদ, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৭।

সর্বরকম অন্যায়-অনাচার, শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পন্থা কী? তারা ভাষা-আন্দোলনকেই হাতির হিশেবে গ্রহণ করে। ভাষা-আন্দোলনকে হাতির হিশেবে আবিষ্কার করার পর তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ভাষা-আন্দোলনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষের অবতারদের মন্তব্যগুলি, যেমন সপক্ষের যুক্তিগুলি ছিল,

১. পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রে একাধিক রাষ্ট্রভাষা রয়েছে, সুতরাং একাধিক রাষ্ট্রভাষা হলেই রাষ্ট্রের সংহতি বিপন্ন হয় না, বিশেষ করে পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থানকে বিবেচনায় এনে, এবং লাহোরপ্রস্তাবের মর্মবাণীর আলোকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলাই অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া অত্যাবশ্যক;

২. বাংলার প্রতি বাঙালির সমর্থনের অর্থ এ-ই নয় যে, উর্দুর প্রতি শত্রুতা, বরং মাতৃভাষার প্রতি সম্মান জানাতেই ভাষা-আন্দোলনের প্রয়োজন;

৩. ভাষা-আন্দোলন রাষ্ট্রদ্রোহীদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে না, বরং দেশ-প্রেমিকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে;

৪. কায়েদে আজাম জাতির পিতা হতে পারেন, তাই বলে তার সব বক্তব্য সঠিক হতে পারে না;

৫. আরবি-হরফে নয়, মাতৃভাষার আদর্শের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের সংহতি সৃষ্টির চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।

আর বিপক্ষের যুক্তিগুলি ছিল,

১. একটি মাত্র রাষ্ট্রভাষা না হলে রাষ্ট্রের সংহতি বিপন্ন হবে;

২. উর্দু ভাষা ইসলামি বিষয়াদিতে বাংলার তুলনায় অধিক সমৃদ্ধ, সুতরাং ইসলামের প্রয়োজনে বাংলার পরিবর্তে উর্দুচর্চায় ব্রতী হওয়া কর্তব্য;

৩. ভাষা-আন্দোলন রাষ্ট্রদ্রোহীদের দ্বারা পারিচালিত সুতরাং ভাষা-আন্দোলনের সহায়তা করা আত্মঘাতীর সামিল;

৪. জাতির পিতা কায়েদে আজম উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলেছেন, সুতরাং রাষ্ট্রের স্বার্থে এর বিরোধিতা করা ঠিক না;

৫. আরবি-হরফে বাংলা ভাষার প্রবর্তন করা হলে শিশুদের একাধিক ভাষা শিক্ষাগ্রহণ করা সহজতর হবে, এবং এর ফলে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাঙালির সংহতি গড়ে তোলাও সহজতর হবে।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

আস্তেধীরে নানা ঘটনার প্রেক্ষাপটে– কোলাহল, অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলা, কোন্দল, দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে– মাতৃভাষা বাংলা ও রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, সচেতন বাঙালি ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী মহলের উপস্থিতে অধ্যাপক নূরুল হক ভূঞাকে আহ্বায়ক হিশেবে নির্বাচিত করে ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'টি গঠিত হয়। গাজিউল হক বলেছেন,

> [...] পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে রশিদ বিল্ডিং নামে যে বিল্ডিং ছিল সেখানে একটি কক্ষে (তমদ্দুন মজলিসের অফিসে) একটি সভা হয়। প্রতিনিধিস্থানীয় ছাত্র, প্রফেসর এবং বুদ্ধিজীবীরা এ সভায় উপস্থিত

ছিলেন। সেখানে মুসলিম ছাত্রলীগের কিছু নেতৃস্থানীয় ছাত্র, গণতান্ত্রিক যুবলীগের কর্মী এবং তমদ্দুন মজলিসের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এটিই সর্বপ্রথম সংগ্রাম পরিষদ। [...] পরিষদের আহ্বায়ক নিযুক্ত হন অধ্যাপক নূরুল হক ভূঞা। তিনি তমদ্দুন মজলিসের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এ কমিটিতে অধ্যাপক আবুল কাশেম, জনাব তোয়াহা, জনাব আখলাকুর রহমান, জনাব আবদুল মতিন খান চৌধুরী ও আজিজ আহমদ ছিলেন। এছাড়াও যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম আজ আর স্মরণ করতে পারছি না।[৫১]

আর মোহাম্মদ তোয়াহা বলেছেন,

[...] 'তমদ্দুন-মজলিস' নামে একটি আধা-রাজনৈতিক আধা-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। [...] তমদ্দুন-মজলিসের অফিস ছিল রশিদ-বিল্ডিং-এর পাশে যে-বিল্ডিং রয়েছে সেখানে। ভাষা নিয়ে সেখানে আলোচনা হত। তৎকালীন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের শাসক খাজা নাজিমুদ্দীন ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ঢাকার স্থানীয় লোকদের ভাষা ছিল ঠিক উর্দু নয়, বাংলা ও উর্দুর মিশ্রিত রূপ। সেসময় মুসলিম লীগ, বিশেষ করে খাজা-পরিবার, ঢাকার স্থানীয় লোকদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ইসলামিক ভাষাতে কথা বলে না, বরং তারা এর বিরোধিতা করে। তখন একদিন পুরনো ঢাকার কিছু স্থানীয় লোকজন লাঠি-সোটা নিয়ে তমদ্দুন মজলিস অফিস চড়াও করে। অফিসের সবকিছু ভেগে তচনচ করে দেয়। সেদিনই সেখান থেকে সবকিছু গুটিয়ে নিয়ে এলাম ফজলুল হক হলে। প্রভোস্ট-অফিসের পশ্চিম-দিকের বারান্দায় অফিস করা হল। বাইরে বড় করে লেখা হল 'রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদ'। আমি অন্য সকলের সঙ্গে আলাপ-পরামর্শ করতাম বটে, কিন্তু নিজে যা বুঝতাম তা-ই সিদ্ধান্ত নিতাম। এতে তমদ্দুন-মজলিসের বন্ধুরা বাধা দেননি। এভাবেই ভাষা-সংগ্রাম-পরিষদের অফিসটা ফজলুল হক হলে এসেছিল।[৫২]

বাংলার ইতিহাসের পাতায় আরও একটি নতুন অধ্যায় রচিত হয়। রচিত হয় রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব। এপর্বে নিখিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রভাষারূপে উর্দুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাঙালির উপর চাপিয়ে দেয় অন্যায়-অবিচারের নীতি ও শোষণের যন্ত্র। পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্যের মায়াছলনায় তারা বাংলা ভাষাকে আঘাত-উপেক্ষা-অবহেলা-অসম্মান করতে থাকে, বিভিন্ন মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে 'যোগাযোগ ও ভাব' আদানপ্রদানের অজুহাতে।

রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু অনিবার্য আশঙ্কায় সচেতন বাঙালি ছাত্র ও শিক্ষিত লোকজন বাংলার চেয়ে নিকৃষ্ট ও অচল একটি খিঁচুড়ি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিশেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে শাসকগোষ্ঠীর প্রকৃতরূপটি উদঘাটিত হয়। পূর্ব-বাংলার শিক্ষিত লোকজন যেমনি পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে বিমুগ্ধচিত্তে, অব্যক্ত আকুলতায় ইসলামধর্ম ও মুসলমান-সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার চেতনায় স্বীয় দেশ ও জাত, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ত্যাগ করে এক হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানের সঙ্গে, ঠিক তেমনি নিজস্ব জাত-দেশ-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ত্যাগের নবমোহটি কাটিয়ে উঠতেও তাদের সময় লাগেনি। শুরু হয় রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বের মধ্য দিয়ে একটি নতুন অধ্যায় রচনার কাজ, নতুন-দিগন্তের স্বরূপ অন্বেষণ।

'ধর্মভিত্তিক' পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর থেকেই উর্দু ভাষাভাষীর প্রভাবে উচ্চপদস্থ আমলাদের মধ্যে পাকিস্তানের মুদ্রা, ডাক-টিকেট, পোস্টকার্ড, এনভেলাপ, মানি-অর্ডার ফরমসহ বিভিন্ন সরকারি দলিলপত্রে ইংরেজির পাশাপাশি শুধুমাত্র উর্দুর ব্যবহার দেখে বাঙালি জনমনে আশঙ্কা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়; এরসঙ্গে পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সচিব গুডইনের প্রচারিত সার্কুলারটি বাঙালির অন্তরে আগুন ধরাতে সাহায্য করে। ৩১টি বিষয়ে উচ্চতর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্যে প্রকাশিত এ-সার্কুলারটির মধ্যে নয়টি ভাষা– উর্দু, হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন, সংস্কৃত ইত্যাদি– স্থান পেলেও নিখিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলার কোনো জায়গা হয়নি। 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর

[৫১] গাজিউল হক, স্মৃতিচারণ, একুশের সংকলন '৮০।
[৫২] মোহাম্মদ তোয়াহা, স্মৃতিচারণ, একুশের সংকলন '৮১।

কয়েকজন সদস্য ও আবুল কাশেম নিখিল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ, তথ্য-প্রচার ও শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ-বিষয়ে আলাপালোচনা করেন, আলোচনা ঠিক নয়, তুমুল তর্কবির্তকই।[৫৩] বির্তকের মূলকারণটি ছিল– অভ্যন্তরীণ, তথ্য-প্রচার ও শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানকে কোনো ভাবেই বোঝানো সম্ভব হচ্ছিল না যে, পূর্ব–বাংলার জনগণের উন্নতি, অবনতি, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রশ্নগুলি রাষ্ট্রভাষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, আর রাষ্ট্রের প্রত্যেক অংশকে আত্মনিয়ন্ত্রণের সমাধিকার দেওয়ার অর্থ এ-নয় যে, গায়ের জোরে বাঙালির ওপর উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়া। অভ্যন্তরীণ, তথ্য-প্রচার ও শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান ছিলেন সরকারের বাংলাবিরোধী নীতির প্রধান মুখপাত্র। অভ্যন্তরীণ, তথ্য-প্রচার ও শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের বাংলা ভাষা হননের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলার জনগণ যখন রুখে দাঁড়ায় তখনই, অর্থাৎ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে, রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনটি সুতীব্রভাবে অগ্নিরূপ ধারণ করে। একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ, তথ্য-প্রচার ও শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের পরপরই 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' বাংলা ভাষার পক্ষে কয়েক হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে একটি স্মারকলিপি সরকারের কাছে পাঠায়, তেমনি অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ, তথ্য-প্রচার ও শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান, ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮, ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কের জনসভায় বক্তৃতা প্রদানকালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, রাষ্ট্রভাষা গণপরিষদের বিবেচনার বিষয়; গণপরিষদ কী করবে না করবে তা তিনি অগ্রীম বলতে পারেন না।[৫৪]

২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮, সাংবাদিকসহ তমদ্দুন মজলিসের রাষ্ট্রভাষা উপকমিটির ও মুসলিম লীগের কয়েকজন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল পূর্ব-বাংলার গণপরিষদের সদস্য হাবিবুল্লাহ বাহার, নূরুল আমীন ও গিয়াসুদ্দীন পাটানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পাকিস্তানের মুদ্রা, টিকেট, মানি-অর্ডার ফরম, নৌ ও অন্যান্য বিভাগে নিয়োগের জন্য পরীক্ষাপত্র থেকে বাংলাকে বাতিল করার কৈফিয়ৎ জানতে চান। তারা অনুরোধ করেন যে, গণপরিষদের সদ্যসরা যেন এসব বিষয়ে গণপরিষদের অধিবেশন (২৩শে ফেব্রুয়ারি) থেকে সঠিক উত্তর নিয়ে আসেন। পূর্ব-বাংলার গণপরিষদের সদস্যরা প্রতিনিধি দলকে বলেন যে, তাঁরা এসব বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।[৫৫]

'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর আহ্বায়ক নূরুল হক ভূঞা, রেহায়ৎ খান, কাজী শামসুল ইসলাম, সরদার ফজলুল করিম, আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী ও অলি আহাদ প্রমুখ বাংলাকে পূর্ব-বাংলার সরকারি ভাষা, শিক্ষার মাধ্যম ও কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারি ভাষা করার দাবীতে পূর্ব-বাংলার প্রত্যেক নাগরিক, শিক্ষিত-সমাজ, বিশেষ করে ছাত্র ও সাহিত্যিক মহলের কাছে অনুরোধ জানিয়ে আবেদনপত্র প্রচার করেন।[৫৬] পূর্ব-বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের কাছে, ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮, সিলেটের শিক্ষিত নারীরা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার দাবী জানিয়ে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। এরকম স্মারকলিপি সরকারের কাছে প্রদান করার মূলকারণগুলির মধ্যে একটি ছিল গণপরিষদের আসন্ন অধিবেশনের আগেই সরকার যেন বাঙালির মতামত সুস্পষ্টভাবে জানতে পারে, এবং সে-অনুযায়ী বাংলার পক্ষে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাব

[৫৩] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব-বাঙালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১৯৭০।
[৫৪] দৈনিক আজাদ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।
[৫৫] বশীর আল্‌হেলাল, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৮৫।
[৫৬] দৈনিক আজাদ, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।

করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হয় ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮, গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিশেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বলেন,

> I know, Sir, that Bengali is a provincial language, but, so far our state is concerned, it is the language of the majority of the people of the state. So although it is a provincial language, as a language of the majority of the people of the state it stands on a different footing. Out of six crores and ninety lakhs of people of people inhabiting this State, 4 crores and 40 lakhs of people speak the Bengali language. So, Sir, what should be the State language of the State of Pakistan? The State language of the State should be the language which is used by the majority of the people of the State, and for that, Sir, I consider that Bengali language is a lingua franca of our State.
>
> It may be contended with a certain amount of force that even in our sister dominion the provincial language have not got the status of a lingua franca because in her sister dominion of India the proceedings of the Constituent Assembly is conducted in Hindustani, Hindi or Urdu or English. It is not conducted in the Bengali language but so far as the Bengali is concerned out of 30 cores of people inhabiting that sister dominion two and a half crores speak the Bengali language. Hindustani, Hindi or Urdu has been given an honoured place in the sister dominion because the majority of the people of the Indian Dominion speak that language. So we are to consider that in our state it is found that the majority of the people of the Indian Dominion speak that language. So we are to consider that in our State it is found that the majority of the people of the State do speak the Bengali language then Bengali should have an honoured place even in the Central Government.
>
> I know, Sir, I voice the sentiments of the vast millions of our. In the meantime I want to let the House Know the feelings of the vastest millions of our State. Even, Sir, in the Eastern Pakistan where the people numbering four crores and forty lakhs speak the Bengali language the common man even if he goes to a Post Office and wants to have a money order form finds that the money order is printed in Urdu language and is not printed in Bengali language or it is printed in English. A poor cultivator, who has got his son, Sir, as a student in the Dacca University and who wants to send money to him, goes to a village Post Office and he asks for a money order form, is printed in Urdu language. He can not send the money order but shall have to rush to a distant town and have this money order form translated for him and then the money order, Sir, that is necessary for his boy can be sent. The poor cultivator, Sir, sells a certain plot of land or a poor cultivator purchases a plot of land and goes to the Stamp vendor and pays him money but cannot say whether he has received the value of the money is Stamps. The value of the Stamp, Sir, is written not in Bengali but is written Urdu and English. But he can't say, Sir, whether he has got the real value of the Stamp. These are the difficulties experienced by the common man of the State.
>
> The language of the State should be such which can be understood by the common man of the State. The common man of the State numbering four crores and forty lakhs find that the proceedings of the Assembly which is their mother of parliaments is being conducted in a language, Sir which is unknown to them. Then, Sir, English has got an honoured place, Sir, in Rule 29. I know, Sir, English has got an honoured placed because of the International Character. But, Sir, if English can have an honoured place in Rule 29 that the proceedings of the Assembly should be conducted in Urdu or English why Bengalee, which is spoken by the four crores forty lakhs of people should not have an honoured place, Sir, in Rule 29 of the procedure Rules.
>
> So, Sir, I know I am voicing the sentiments of the vast millions of our State and therefore Bengali should not be treated as a Provincial Language. It should be treated as the language of the State. And, therefore, Sir, I suggest that after the word 'English, the words 'Bengali' be inserted in Rule 29. I do not wish to detain the House but I wish that the Members of the Constituent Assembly present here should give a consideration to the sentiments of the vast

> millions of our State, Sir, and should accept the amendment to Rule 29 that has been moved by me.[57]

এ-অধিবেশনে দুটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, এক– বৎসরে অন্ততপক্ষে একবার হলেও যেন ঢাকায় 'পাকিস্তান গণপরিষদ'-এর একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়; আর দুই– ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলা ভাষাকেও গণপরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিশেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথম সংশোধনী প্রস্তাবটি অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন (২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮) আলোচনার মাধ্যমে বাতিল হয়ে যায়, আর দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবটি অধিবেশনের তৃতীয় দিন (২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮) পরিষদের সদস্যদের মধ্যে প্রচুর বিতর্ক সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবটির আলোচনাকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বলেন,

> He (Mr. Dhirendra Nath Datta) should realise that Pakistan has been created because of the demand of a hundred million Muslim in this sub-continent and the language of hundred million Muslim is Urdu [...].[58]

তিনি আরও বলেন,

> এখানে এই প্রশ্নটি তোলাই ভুল হয়েছে। এটি আমাদের জন্যে একটি জীবনমরণ সমস্যা। আমি অত্যন্ত তীব্রভাবে এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করি এবং আশা করি যে এ-ধরনের একটি সংশোধনী প্রস্ত াবকে পরিষদ অগ্রাহ্য করবেন। [...] প্রথমে সংশোধনী প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নির্দোষ বলে আমি মনে করেছিলাম। প্রস্তাবে বাংলাকে পরিষদের ভাষার অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছাপ্রকাশ করা হয়েছিল, কিন্তু এখন মনে হয় পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা একটি সাধারণ ভাষার দ্বারা ঐক্যসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করাই এ-প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।[৫৯]

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানকে মুসলিম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলেও জিন্নাহ তার অনেক ঘোষণায় ও বিবৃতিতে পাকিস্তানকে ধর্মনিরপেক্ষ-রাষ্ট্র হিশেবে উল্লেখ করেন, তাই 'উর্দুই পাকিস্ত ানের মুসলমানদের ভাষা হওয়া উচিত'[৬০]– কথাটি মেনে নেওয়ার কোনো যুক্তিগত কারণ ছিল না। মোগল আমলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে যে-ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল তাই উর্দু ভাষা, এরমধ্যে মুসলমানি-গন্ধ আছে বলে মনে হয় না। এক কথায় উর্দু হচ্ছে একটি প্রচীনভিত্তিহীন ভাষা, যার উৎপত্তি মোগল আমলে। স্পষ্ট করে বলা যায়, সম্রাট শাহজাহানের (১৬২৮-১৬৫৮) রাজত্বকালে 'উর্দু-ই-মৌল্লা'-য়, সম্রাটের ফৌজলস্করের ছাউনিগুলিতে, ভারতবর্ষীয় 'খরিবুলি', 'ব্রজবুলি', 'রাজিস্তানি' ও 'হিন্দুস্থানি' ভাষার সংমিশ্রণে যে কথ্যভাষার উদ্ভব ঘটে তাই 'জবান-ই-উর্দু-ই মৌল্লা'; একে সম্রাট শাহজাহানের পুত্র সম্রাট আওরঙ্গজেব, ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে, সংক্ষিপ্ত করে নামকরণ করেন 'উর্দু', যার অর্থ হচ্ছে 'ওরদু' (তুর্কি) বা সৈন্যছাউনি (বাংলা)। উর্দু ভাষা সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব বা বাংলাঞ্চলের মানুষের মাতৃভাষা নয়, তাই পাকিস্তানের মুসলমান জনসাধারণের জাতীয়ভাষা উর্দু বলে যে দাবী করার হয় তার কোনো ভিত্তি নেই। এরকম একটি সহজ কথা পূর্ব-বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনও বুঝতে চাননি, বরং উলটোই বুঝলেন, তাই তিনি অদ্ভুতভাবে বলেন,

> I think there will be no contradiction if I say that as far as Bengali is concerned - as far as inter-communication between the Provinces is concerned - there is a feeling that Urdu can be the only language that can be adopted. But there is a strong feeling that as far as the Province

[৫৭] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র: প্রথম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২।
[৫৮] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র: প্রথম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২।
[৫৯] আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।
[৬০] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র: প্রথম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২।

> is concerned the medium of instruction should be Bengali in educational institutions and as far as administration is concerned.[61]

অর্থাৎ, উর্দুই একমাত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযুক্ত বলে পূর্ব-বাংলার অধিকাংশ লোকের অভিমত, তবে পূর্ব-বাংলার শিক্ষা ও শাসনকার্যের ক্ষেত্রে যথাসময়ে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হবে। খাজা নাজিমুদ্দীন তার নিজস্ব অভিমত সমগ্র বাঙালি জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেননি।

সিন্ধুর এম. এইচ. গাজদার প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে বলেন, 'প্রস্তাবটিকে বাইরে থেকে নির্দোষ বলে মনে হলেও পাকিস্তানের পক্ষে এ বিপজ্জনক।'[৬২] কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজন্‌ফর আলী খান বলেন, 'পাকিস্তানে একটি মাত্র সাধারণ ভাষা থাকবে এবং সে ভাষা হচ্ছে উর্দু। আমি আশা করি যে, অচিরেই সমস্ত পাকিস্তানি ভালোভাবে উর্দু শিক্ষা করে উর্দুতে কথাবার্তা বলতে সক্ষম হবে। [...] উর্দু কোনো প্রদেশের ভাষা নয়, তা হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতির ভাষা এবং উর্দু ভাষাই হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতি।'[৬৩] গণ-পরিষদের সহ-সভাপতি তমিজুদ্দীন খান বলেন, 'পরিষদের কংগ্রেসী দলের নেতার বিবৃতির একটি বিষয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানকে পরিষদের নেতা মুসলিমরাষ্ট্র বলেছেন, সুতরাং সংখ্যালঘুরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কিত হবে। এই পরিষদের প্রথম বক্তৃতায় এবং পরে বহু জনসভায় পরিষদের সভাপতি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে সংখ্যাগুরুদের সমান অধিকারই সংখ্যালঘুরা ভোগ করবে। রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত পাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিকই সমান অধিকার ও সুবিধা ভোগ করবে।'[৬৪]

পূর্ব-বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন, সিন্ধুর এম. এইচ. গাজদার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজন্‌ফর আলী খান, গণপরিষদের সহ-সভাপতি তমিজুদ্দীন খান, প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান প্রমুখ দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবটির বিরোধিতা করলেও এর পক্ষে ছিলেন কংগ্রেস দলের অস্থায়ী নেতা শ্রীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গণপরিষদের কংগ্রেস-দলের সেক্রেটারি রাজকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ। পরিষদের কংগ্রেস দলের অস্থায়ী নেতা শ্রীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংশোধন-প্রস্তাবের সমর্থন করে বলেন, 'এতদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল, পাকিস্তান জনগণের, সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু উভয় সম্প্রদায়ের রাষ্ট্র। কিন্তু পরিষদের নেতার বিবৃতি সম্পর্কে অ-মুসলমানদের বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। শাসনতন্ত্র গঠনে অ-মুসলমানের কোনো অধিকার আছে কিনা সে-কথা এখন তাঁদের ভেবে দেখতে হবে। সংশোধন-প্রস্তাবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীও করা হয়নি। উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকে পরিষদের ভাষা হিশেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী করা হয়েছে।'[৬৫] গণ-পরিষদে কংগ্রেস-দলের সেক্রেটারি রাজকুমার চক্রবর্তী বলেন, 'উর্দু পাকিস্তানের কোনো প্রদেশেরই কথ্য ভাষা নয়, এ হচ্ছে উপরতলার কিছু সংখ্যক মানুষের ভাষা। পূর্ব-বাংলা এমনিতেই কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচি থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, তার উপর এখন তাঁদের ঘাড়ে একটি ভাষাও চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। একে গণতন্ত্র বলে না। আসলে এ হচ্ছে নিম্নশ্রেণীর মানুষের উপর উচ্চশ্রেণীর আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা। বাংলাকে আমরা দুই অংশের সাধারণ ভাষা করার জন্যে কোনো চাপ দিচ্ছি না। আমরা শুধু চাই পরিষদের সরকারি ভাষা হিশেবে বাংলার স্বীকৃতি। ইংরেজিকে যদি সে-মর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে বাংলা ভাষাও সেই মর্যাদার অধিকারী।'[৬৬] গণপরিষদের সহ-সভাপতি তমিজুদ্দীন খানের নেতৃত্বে পরিষদের প্রত্যক মুসলমান সদস্য (সবাই লীগের সদস্য) এ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় বাংলার পক্ষে প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়।

---

[৬১] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র: প্রথম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২।
[৬২] বশীর আল্‌হেলাল, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৮৫।
[৬৩] পত্রিকা, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।
[৬৪] বশীর আল্‌হেলাল, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৮৫।
[৬৫] বশীর আল্‌হেলাল, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৮৫।
[৬৬] পত্রিকা, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের মূলসংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটের মাধ্যমে অগ্রাহ্য হওয়ার খবর পূর্ব-বাংলায় পৌঁছানো মাত্রই শিক্ষিতমহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে খাজা নাজিমুদ্দীনের 'উর্দুই একমাত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে'– এরকম একটি অদ্ভুত, ছন্নছাড়া মন্তব্য প্রকাশের কারণে। গণপরিষদের পূর্ব-বাংলার মুসলিম লীগের সদস্যরা অন্যতম ভাষা হিশেবে বাংলার বিরুদ্ধে ভোটপ্রদান করার বিষয়টিও সর্বমহলের বাঙালি অন্তরকে বিক্ষুব্ধ ও মর্মাহত করে তুলে, এ হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ ধীরেন্দ্রনাথের মূলসংশোধনী প্রস্তাবটি ছিল গণপরিষদের অন্যতম ভাষারূপে বাংলাকে সম্মান প্রদান করা, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হওয়ার ফলে বাংলার মানুষ বুঝতে পারে, মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের অন্যতম ভাষা হিশেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দিতে নারাজ।

পূর্ব-বাংলায় মন্থরগতিতে হলেও বাঙালি নিধন করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দৃঢ়ভাবে প্রকাশ হতে শুরু করে। বলা বাহুল্য, গণপরিষদের তৃতীয় দিনের অধিবেশন (২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮) অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই রাজশাহীতে ছাত্রদের একটি বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শিত হয়, এমনকী ধর্মঘটও পালন করা হয়। ভূবনমোহন পার্কে, দুপুর ১টার ছাত্রসভায়, কাজী জহুরুল হকের সভাপতিত্বে, পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলার দাবী সমর্থনে কয়েকটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়,

১. বাংলাকে পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্রভাষা করতে হবে;

২. নৌবিভাগে নিয়োগ-পরীক্ষা পূর্ব-বাংলার যুবকদের বেলায় বাংলা ভাষায় নিতে হবে;

৩. বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে;

৪. পাকিস্তানে মুদ্রা ও ডাকটিকিটে বাংলা ভাষার স্থান চাই।[৬৭]

সভা শেষে ছাত্রদের স্বাক্ষরযুক্ত একটি স্মারকপত্র গণপরিষদের সভাপতি ও পূর্ব-বাংলার প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়।

রাষ্ট্রভাষার জন্য সংগ্রাম

দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার পর, বাঙালির মাঝে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়; শুরু হয় মিছিল, বক্তৃতা, প্রতিবাদ, নিন্দা– বিশেষ করে নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতার বিরুদ্ধে, বাঙালি মুসলিম লীগের সদস্যদের আচরণের বিরুদ্ধে, গণপরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে; একইসঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকেও অভিনন্দন জানানো হয়। স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়াগুলি কখন, কোথায় ও কীভাবে ঘটে এসব লক্ষ্য করা অবশ্যক।

২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭, প্রতিক্রিয়ার অংশ হিশেবে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও জগন্নাথ কলেজের উদ্যোগে ঢাকা শহরের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ক্লাশ বর্জন করে।[৬৮]

২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮, রাজশাহীর নওগাঁয় ভাষা-আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হয়। বরিশাল মুসলিম ইনস্টিটিউটেও মুসলিম ছাত্রদের উদ্যোগে বাংলা ভাষার পক্ষে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, এবং সভা শেষে বিক্ষুব্ধ বাঙালি ছাত্র-জনতা মিলে একটি শোভাযাত্রা করে বাংলা ভাষার পক্ষে শ্লোগান তুলে শহর প্রদক্ষিণ করে। বরিশালের বি. এম. কলেজেও একটি প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়।

[৬৭] বশীর আলহেলাল, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৮৫।
[৬৮] আহমদ রফিক, একুশের ইতিহাস/ আমাদের ইতিহাস, ১৯৮৮।

২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮, খুলনার দৌলতপুর কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে বাংলা ভাষার দাবীতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিনাজপুরে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ধর্মঘট পালন করে। পাবনায় 'বাংলা ভাষার দাবী মানতে হবে' শ্লোগানে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। বাংলাকে পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে শোভযাত্রা শেষে একটি সভা ও সন্ধ্যায় টাইন হলে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুরূপভাবে ছাত্রনেতাকর্মীরা চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, মুন্সীগঞ্জ, সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলে হরতাল, শোভাযাত্রা, জনসভার আয়োজন করে। পূর্ব-বাংলার ছাত্রনেতাকর্মীরা জনসাধারণের প্রতি লাহোর-প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ও নীতিকে সার্থক করার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়। চলতে থাকে পূর্ব-বাংলার প্রধানমন্ত্রীর উক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সভা-সমিতি ও মিছিল-বিক্ষোভ।

২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮, বাংলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী কলকাতা থেকে বাংলা ভাষার পক্ষে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন, তিনি বলেন যে, কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ভাষার প্রতি হস্তক্ষেপ কিংবা তার পরিবর্তনের চেষ্টা করা হলে সে-চেষ্টার বিরুদ্ধে গভীর প্রতিবাদ উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক, পাঁচ কোটি মানুষের ভাষা সম্পর্কে তো কথাই নেই। পূর্ব-বাংলায়, এমনকী সমগ্র পাকিস্তানে, বাংলা ভাষার স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। উর্দু একটি সাধারণ আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা বলে তা পাকিস্তানের সাধারণ-ভাষা হবে, সে-সম্পর্কে দ্বিমত হবার কোনো কারণ নেই। উর্দুর স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনা করলে তা পূর্ব-বাংলার স্কুলসমূহের দ্বিতীয় ভাষারূপে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। অনুরূপভাবে পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্রভাষা হিশেবে সকল স্তরের শিক্ষার মাধ্যম ও সংস্কৃতির দিক থেকে বাংলা ভাষার স্থান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অধিকন্তু, পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংহতি ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে পশ্চিম-পাকিস্তানের স্কুল-কলেজসমূহে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা বিশেষ যুক্তিসঙ্গত হবে। তিনি উপস্থিত পরিস্থিতি উপলব্ধি করে ও জনসাধারণের দাবী বিবেচনা করে ভাষা-সমস্যা সম্পর্কে একটি সরকারি বিবৃতি আশা করেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হলে গণপরিষদের বির্তক সম্পর্কে ভুল ও অহেতুক ধারণা দূরীভূত হবে।[৬৯]

২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮, তমদ্দুন মজলিস ও পূর্ব-বাংলা মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মিলিত পদক্ষেপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বিভাগের ছাত্রবৃন্দ তাদের ক্লাশ-বর্জন করে একটি সভার আয়োজন করে, এখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, গণপরিষদের সরকারি ভাষার তালিকা, মুদ্রা ও ডাক-টিকেট এবং নৌ-বাহিনীতে নিয়োগ-পরীক্ষা থেকে বাংলাকে বাতিল করার প্রতিবাদে আগামী ১১ই মার্চ সমগ্র পূর্ব-বাংলা জুড়ে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হবে; বাংলা ভাষাকে অবিলম্বে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব-বাংলার সরকারি ভাষা হিশেবে ঘোষণা দেওয়ার আহ্বানও জানানো হয়।[৭০] বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলন যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেজন্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষালয়সমূহের প্রতি সহযোগিতার আবেদন জানানো হয়।[৭১]

২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮, ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। '২৯শের ধর্মঘট সম্পূর্ণ সফল হয়। ঐদিন মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে সেক্রেটারিয়েটের দিকে এগুতে থাকে। [...] পাকিস্তান সৃষ্টির পর এটিই বৃহত্তম বিক্ষোভ মিছিল। সরকার এ ধর্মঘটকে বানচাল করার জন্য খুব সচেষ্ট ছিল। পুলিশকে লেলিয়ে দেওয়া হল। পুলিশ ছাত্র-জনতার মিছিলে লাঠি-চার্জ শুরু করে এবং সেদিন অনেককে গ্রেফতার করে।'[৭২]

[৬৯] দৈনিক আজাদ, ২৯শে জানুয়ারি ১৯৪৮।
[৭০] বশীর আল্‌হেলাল, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৮৫।
[৭১] দৈনিক আজাদ, ২রা মার্চ ১৯৪৮।
[৭২] এ. এস. এম. নূরুল হক ভূঞা, স্মৃতিচারণ, একুশের সংকলন '৮০।

১লা মার্চ ১৯৪৮, একটি যুক্তবিবৃতিতে অধ্যাপক আবুল কাশেম, শেখ মুজিবুর রহমান, নঈমুদ্দীন আহমদ ও আব্দুর রহমান চৌধুরী বলেন, 'তমদ্দুন মজলিসের রাষ্ট্রভাষা সাবকমিটির এক যুক্ত-অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১১ই মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়েছে এ-সম্পর্কে বিস্তারিত কর্মপন্থা যথাসময়ে প্রচারিত হবে। [...] আমরা পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র ও যুব সমাজের কাছে আবেদন জানিয়ে বলি: ওঠো, জাগো, এই ষড়যন্ত্রকে তোমাদের নিজ শক্তি-বলে চুরমার করে দাও। দেশব্যাপী এমন আন্দোলন গড়ে তুলো, যার ফলে বাংলাকে অচিরে আমাদের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করতে সরকার বাধ্য হয়।'[৭৩] অন্যদিকে পূর্ব-বাংলা সরকার একটি বিবৃতিতে বলে যে, পাকিস্তান গণপরিষদে উর্দু ও ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে যে-প্রস্তাব গৃহীত হয় সে-সম্পর্কে জনসাধারণের মনে একটি ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রস্তাবে একথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উর্দু বা ইংরেজি কোনো ভাষাতেই বক্তার অধিকার না থাকলে সভাপতি তাকে অন্য ভাষায় বক্তৃতাপ্রদান করার অনুমতি দিতে পারেন, যা শুধু পাকিস্তান পার্লামেন্ট সম্পর্কেই প্রযোজ্য। পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা এরপর প্রদেশের জনমত অনুসারে স্থির করা হবে। এ-ভ্রান্তধারণার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রের শত্রুরা পূর্ব-বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির চেষ্টা করছে। জনসাধারণকে সর্তক করে দেওয়া হচ্ছে যে, কোনোরূপ গোলযোগ হলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।[৭৪]

২রা মার্চ ১৯৪৮, গণপরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও মুসলিম লীগের নেতাবৃন্দের বাংলা-ভাষা-বিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে 'গণ-আজাদী লীগ', 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ', 'তমদ্দুন মজলিস', 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল', 'ফজলুল হক মুসলিম হল'-এর নেতাকর্মী ও ছাত্রদের উদ্যোগে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন আজিজ আহমদ, অজিত গুহ, আবুল কাশেম, শামসুদ্দীন আহমদ, কাজী গোলাম মাহবুব, নঈমুদ্দীন আহমদ, তফজ্জল আলী, আলী আহমেদ, মহীউদ্দীন, আনোয়ারা খাতুন, শামসুল আলম, শওকত আলী, আবদুল আউয়াল, মোহাম্মদ তোয়াদা, অলি আহাদ, শামসুল হক, শহীদুল্লাহ কায়সার, লিলি খান, তাজুদ্দীন আহমদ, কমরুদ্দীন আহমেদ (সভাপতি) প্রমুখ।[৭৫] আর কম্যুনিস্ট পার্টির তরফ থেকে সর্দার ফজলুল করিম ও রণেশ দাসগুপ্ত এবং মেডিক্যাল ব্যারাক থেকে আমজাদ, হাই ও করিম উপস্থিত ছিলেন।[৭৬] এখান থেকেই, প্রতিটি সংগঠন থেকে দুজন করে মনোনীত সদস্যের প্রতিনিধিত্বে ও শামসুল আলমকে আহ্বায়ক হিশেবে মনোনীত করে, গঠিত হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ও তার একটি উপকমিটি। উপকমিটিটির সদস্যরা ৪ঠা ও ৫ই মার্চ (বিকাল পাঁচটায়) ফজলুল হক হলে সমাবেত হয়ে ১১ই মার্চের ধর্মঘট সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন।[৭৭]

৮ই মার্চ ১৯৪৮, সিলেট তমদ্দুন মজলিস ও সিলেট জেলা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে গোবিন্দ পার্কে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। প্রসঙ্গত, সিলেট-হবিগঞ্জ-মৌলভীবাজার-সুনামনঞ্জের ছাত্র, সাংবাদিক, মহিলাকর্মী ও সাধারণ অধিবাসীরা বাংলা ভাষার পক্ষে সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে অগ্রণী ভূমিকা পালন ও দৃঢ়ভাবে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

১০ই মার্চ ১৯৪৮ (রাত), ফজলুল হক হলে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর উদ্যোগে একটি সভার আয়োজন করা হয়, এবং এ-সভায় ১১ই মার্চের ধর্মঘট সম্বন্ধে বিস্তারিত কর্মসূচী ও দেশব্যাপী সাফল্যমণ্ডিত ধর্মঘট পালন করার জন্য ব্যাপক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

[৭৩] বশীর আল্‌হেলাল, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৮৫।
[৭৪] দৈনিক আজাদ, ৩রা মার্চ ১৯৪৮।
[৭৫] বশীর আল্‌হেলাল, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৮৫।
[৭৬] আহমদ রফিক, একুশের ইতিহাস/ আমাদের ইতিহাস, ১৯৮৮।
[৭৭] বশীর আল্‌হেলাল, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৮৫।

১১ই মার্চের রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন

১১ই মার্চ ১৯৪৮ (বৃহস্পতিবার), সকাল থেকেই, পূর্ব সিদ্ধান্তানুযায়ী, ছাত্রকর্মীরা ধর্মঘটকে সফল করার জন্য জড়ো হতে থাকে– নীলক্ষেতে, পলাশী ব্যারকে, রমনা ডাকঘরের সামনে, হাইকোর্ট গেটে, ইডেন বিল্ডিংয়ের সামনে, রেলওয়ার্কশপ ও রেলওয়ে হাসপাতালের সামনে, জেলা আদালতের সামনে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণসহ বিভিন্ন স্থানে ছাত্ররা শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও 'পুলিশী জুলুম'[৭৮] শুরু হয় তাদের উপর। পিকিটিং চলাকালে ছাত্রদের ওপর পুলিশবাহিনী বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে, রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ তুলে, কাঁদুনে-গ্যাস নিক্ষেপ করে। পুলিশ-সুপারিনটেন্ডেন্ট গফুরের নেতৃত্বে ১৩-১৪জনকে গ্রেফতার করা হয়। হাইকোর্টের গেটের সামনে ছাত্ররা যখন পিকেটিং করে তখন আইনজীবীগণ ভিতরে প্রবেশ করার জন্য প্রতিবাদী ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা-বোঝানো-বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন; এমনকী এ. কে. ফজলুল হকও শান্তভাবে ছাত্রদের হাইকোর্ট এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন, কিন্তু ছাত্ররা অনড় থাকে। পুলিশবাহিনী ছাত্রদের উপর লাঠি চালালে আইনজীবীগণ আদালত বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৭৯] নেতাকর্মীবৃন্দ সচিবালয়ের (ইডেন বিল্ডিংয়ের) সামনে শ্লোগান দিয়ে কর্মচারীদের অফিস-বর্জন করার অনুরোধ করেন। তোপখানা রোড ও আবদুল গণি রোড, সচিবালয়ের উভয় গেটে পিকেটিং চলাকালে শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ ও নির্দিষ্ট অভিযোগের কারণে শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে কোতোয়ালি জলে বন্দী করা হয়, পরে তাদেরকে ঢাকা জেলখানায় স্থানান্তরিত করা হয়। পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, একটি সভার আয়োজন করা হয়, এতে সভাপতিত্ব করেন পূর্ব-বাংলার মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দীন আহমদ। এখানে পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়। দাবীও জানানো হয় যে, পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ব-বাংলার যেসব সদস্য বাঙালির স্বার্থরক্ষা করতে অক্ষম হয়েছেন তাঁদের অবিলম্বে পদত্যাগ করার জন্য। সভাশেষে ছাত্রদের একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।[৮০]

১১ই মার্চ ১৯৪৮, এদিন শহরের অধিকাংশ দোকানপাট ও বিভিন্ন বিদ্যালয় বন্ধ থাকে, এমনকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশগুলি ছাত্রশূন্য হয়ে পড়ে।[৮১] ধর্মঘটের মাধ্যমে দেশবাসী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনে নেমে পড়লে বাংলার আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হতে থাকে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। ১১ই মার্চের রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন শুধু প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব-বাংলার শহর-উপশহরে– বগুড়া, রাজশাহী, সিলেট, যশোর, নোয়াখালি, কুমিলা, চট্টগ্রাম, খুলনা, পবনা, রংপুর, দিনাজপুর, জামালপুর, চাঁদপুর, রায়পুর, হোসেনপুর, ধলঘাট, মরোধাতলী, কাটিরহাট, নানুঘর, কুইরাইল, নোয়াপাড়া, আর্যামিত্র, কোয়েপাকা, মহামনি, রাধারাণী, কেলিশহর, তাম্বুকা, খোকশা, ময়মনসিংহ, হবিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন স্থানে।[৮২] সৃষ্টি হয় বাংলা ভাষার দাবীতে স্থানীয় ছাত্রমহলে বিক্ষোভ ও উত্তেজনা, এবং ধর্মঘট-সভা-মিছিল। কোনো কোনো স্থানে নিখিল পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের গুণ্ডাবাহিনী সাধারণ বাঙালির ওপর হামলাও চালায়– মারপিট, নির্যাতন ও অত্যাচার কোনো কিছুরই কমতি ছিল না। পুলিশ-গোয়েন্দা ও কায়েমী স্বার্থের দল হাত ধরাধরি করে রাষ্ট্রভাষা-

[78] Government of East Bengal, B-Procedings, Legislative Department, No 698-705; Legislative Motion Statement.
[৭৯] দৈনিক পত্রিকা, ১২ই মার্চ ১৯৪৮।
[৮০] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১৯৭০।
[৮১] ঢাকা প্রকাশ, ১৫ই মার্চ ১৯৪৮।
[৮২] ঢাকা প্রকাশ, ১৫ই মার্চ ১৯৪৮।

আন্দোলনকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে বাঙালি ছাত্র-জনতার উপর গুলিবর্ষণ করে।[৮৩] পুলিশবাহিনীর হাতে ফজলুল হকসহ প্রায় ২০০জন (১৮জন গুরুতরভাবে) আহত হন, এবং ৯০০জন ধৃত হন।[৮৪] পুলিশের ভীষণ প্রহারে অজ্ঞান অবস্থায় অনেক ছাত্র হাসপাতালে ভর্তিও হয়। একইদিন গুণ্ডাবাহিনীর সদস্যরা কম্যুনিস্ট পার্টি এবং রেলরোড ওয়ার্কাস ইউনিয়নের অফিস আক্রমণ করে, এবং অফিসের ভিতরে ঢুকে আসবাবপত্র ভেঙে কাগজপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়।

১৯৪৮-এর রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে নেতৃত্বদানে এগিয়ে আসেন– মুনীর চৌধুরী, আব্দুল রহমান চৌধুরী, এ. কে. এম. আহসান, কল্যাণ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক আবুল কাশেম, নঈমুদ্দীন আহদম, ফরিদ আহমদ, মো. তোয়াহা, আখলাবুক রহমান, শামসুল করিম, অধ্যাপক নূরুল হক ভূঞা, শেখ মুজিবুর রহমান, আজিজ আহমদ, কমরুদ্দীন আহমদ, তাজুদ্দীন আহমদ, শহীদুল্লাহ কায়সার, আব্দুল হামিদ চৌধুরী, মোল্লাহ জাল্লাল উদ্দীন প্রমুখ।[৮৫]

১২ই মার্চ ১৯৪৮, একদিকে জগন্নাথ কলেজে প্রতিবাদ সভার অনুষ্ঠান, অন্যদিকে পূর্ব-বাংলার ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দীন আহমদ একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলেন যে, দেশের শতকরা ৬৮ভাগ মানুষের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন দমন করার জন্যে নাজিমুদ্দীন-সরকার ফ্যাসিস্টনীতি অবলম্বন করছে, নিরীহ ছাত্রদের উপর গুলি চালাচ্ছে, লাঠিচার্জ এবং গ্রেফতার করছে; এমনকী যেসব যুবক ও ছাত্র ব্রিটিশ বেয়নেটের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদের উপরও উৎপীড়ন করতে দ্বিধাবোধ করছে না।[৮৬] ১৩ই-১৪ই মার্চ ১৯৪৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়।

আট-দফা চুক্তি

১৫ই মার্চ ১৯৪৮, নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, এতে সরকারের পক্ষে নাজিমুদ্দীন আর পরিষদের পক্ষে কমরুদ্দীন আহমদ একটি আট-দফা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। আট-দফা চুক্তিতে বলা হয় যে,

১. ২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ থেকে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের অবিলম্বে মুক্তিদান করা হবে;

২. পুলিশ-কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করে একমাসের মধ্যে এ-বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করবেন;

৩. ১৯৪৮-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব-বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারি আলোচনার জন্য যেদিন নির্ধারণ করা হয়েছে সেদিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার এবং তাকে পাকিস্তান গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষা দিতে উর্দুর সমমর্যাদাদানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে;

৪. এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এ-মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে যে, প্রদেশের সরকারি ভাষা হিশেবে ইংরেজি ওঠে যাওয়ার পরই বাংলা তার স্থলে সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃত হবে। এছাড়া শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল-কলেজগুলিতে অধিকাংশ হারে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হবে;

৫. আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না;

[৮৩] বশীর আল্‌হেলাল, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৮৫।
[৮৪] ঢাকা প্রকাশ, ১৫ই মার্চ ১৯৪৭।
[৮৫] বশীর আল্‌হেলাল, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৮৫।
[৮৬] বশীর আল্‌হেলাল, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৮৫।

৬. সংবাদপত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে;

৭. ২৯শে ফেব্রুয়ারি থেকে পূর্ব-বাংলার যেসব স্থানে ভাষা-আন্দোলনের জন্য ১৪৪-ধারা জারি করা হয়েছে সেখান থেকে তা প্রত্যাহার করা হবে;

৮. সংগ্রাম-পরিষদের সঙ্গে আলোচনার পর সরকার এ-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েছে যে, ভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কেউ রাষ্ট্রের দুশমন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি।[৮৭]

সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে নাজিমুদ্দীনের এরকম একটি আট-দফা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ ছিল ১৯শে মার্চ (১৯৪৮) জিন্নাহ ঢাকা-সফরে আসার উপলক্ষে যেন কোনোরকম জটিলতা বা সমস্যা সৃষ্টি না হয়। ১৫ই মার্চ ১৯৪৮, পূর্ব-বাংলা পরিষদের অধিবেশনে আবদুল করিম (স্পিকার), নজমুল হক (ডেপুটি স্পিকার), ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, মনোরঞ্জন ধর, মুহম্মদ আলী, ফজলুল হক, আনোয়ারা খাতুন, হামিদুল হক, তফজ্জল আলী, নেলী সেনগুপ্তা, খাজা নসরুল্লাহ, আবদুল মালেক প্রমুখ পরিষদ-সদস্যদের উপস্থিতে মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন আট-দফা চুক্তিপত্রটি পাঠ করেন।[৮৮] পরিষদ-ভবনের সামনে ক্রমবর্ধমান ছাত্রবিক্ষোভ ও পরিষদের অভ্যন্তরে সদস্যদের বিক্ষোভ প্রদর্শিত হতে থাকলে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন পরিষদকক্ষ পরিত্যাগ করে নিজ-অফিসে গিয়ে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন।

১৫ই মার্চ ১৯৪৮ (সন্ধ্যা), ১১ই মার্চের রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে জড়িত জেলবন্দীরা মুক্তি পাওয়ার পর তাদের উদ্দেশ্যে ফজলুল হক হলে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৬ই মার্চ, ফজলুল হক হলে আরকেটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়; এসময় শওকত আলী ও শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী ও সংগ্রাম-পরিষদের মধ্যেকার আট-দফা চুক্তির সংশোধনী প্রস্তাবাবলী উত্থাপন করেন, এতে বলা হয় যে,

১. ঢাকাসহ অন্যান্য জেলায় পুলিশের বাড়াবাড়ি সম্পর্কে তদন্তের জন্য সংগ্রাম-কমিটি-কর্তৃক অনুমোদিত এবং সরকারি-বেসরকারি সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি তদন্ত-কমিটি নিয়োগ করতে হবে;

২. বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের সুপারিশ করে প্রস্তাবগ্রহণের উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য পূর্ব-বাংলা পরিষদের অধিবেশন চলাকালে একটি বিশেষ দিন নির্ধারণ করতে হবে; এবং

৩. সংবিধানসভা-কর্তৃক তারা উপরোক্ত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করতে অসমর্থ হলে সংবিধানসভার এবং পূর্ব-বাংলা মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদত্যাগ করতে হবে।[৮৯]

সংশোধনী প্রস্তাবগুলি ছাত্রদের দ্বারা গৃহীত হওয়ার পর তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতার পর সরকারের বিরুদ্ধে ও বাংলা ভাষার সমর্থনে একটি মিছিল পরিষদ-ভবনের সামনে পৌঁছলে পরিষদ-সদস্যদের মধ্যে বিক্ষোভ ও হট্টগোল সৃষ্টি হয়। মিছিলটিকে আয়ত্ত্বে রাখার জন্য পুলিশবাহিনী লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে-গ্যাস নিক্ষেপ করে, এরইসঙ্গে বন্দুকে ফাঁকা-গুলির আওয়াজ তুলে আতঙ্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। পুলিশের নির্যাতনে ঘটনাস্থলে ১৯জন জনতা আহত হয়। এ-প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন একটি বিবৃতি প্রকাশ করতে বাধ্য হন,

> [...] কিছুদিন যাবৎ ভাষা-সম্পর্কিত যে-বিক্ষোভ চলছে, সংগ্রাম-পরিষদের সঙ্গে আপোষ-চুক্তির বিশেষ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তার অবসান হওয়া উচিত ছিল। চুক্তির পর ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে, ১৪৪-ধারা প্রত্যাহার করা হয়েছে। [...] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের জন্য প্রসিদ্ধ কতকগুলি লোক চুক্তি অস্বীকার করে পরিষদ-ভবনের চারদিকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। [...] বিক্ষোভকারীরা

[৮৭] অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৬ই মার্চ ১৯৪৮।
[৮৮] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১৯৭০।
[৮৯] বশীর আল্‌হেলাল, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৮৫।

প্রবেশদ্বার আটক করে পরিষদ-সদস্যদের বাইরে যেতে বাধা প্রদান করে। বিক্ষোভকারীরা সদস্যগণকে অপমান করে. তাদের অন্যত্র নিয়ে যায় হয়। এ-পর্যন্ত অন্তত ৯জন সদস্য তাদের অপমানিত করা হয়েছে বলে আমাকে জানান। সদস্যদের শুধু ভয় প্রদর্শনই করা হয়নি, পবিত্র কোরান স্পর্শ করে বিক্ষোভকারীদের ইচ্ছানুযায়ী চলার শপথ করতেও বলা হয়। পরিষদ-কক্ষ থেকে পুলিশের সাহায্যে সদস্যদের নিয়ে যাওয়ার সময়েও বিক্ষোভকারীরা অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করে এবং তাদের গাড়ির দিকে ইট, পাথর নিক্ষেপ করে। গাড়িগুলির ক্ষতি হয়, কয়েকজন সদস্য আঘাত পান। ১৪জন পুলিশ আহত হয়। আত্মরক্ষার্থে পুলিশ গুলির ফাঁকা আওয়াজ করতে বাধ্য হয়, তাতে কেউ আহত হয়নি। উপরোক্ত ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, রাষ্ট্রকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে এই দল ভাষাবিরোধ সংক্রান্ত প্রশ্নটিকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করছে। [...] তাদের কেউ কেউ পাকিস্তানের মূল শিকড়ে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক শাসনযন্ত্রকে পর্যুদস্ত করতে চায়। সুতরাং পাকিস্তানের জনসাধারণ, বিশেষভাবে ছাত্র-সম্প্রদায় যাতে বিভ্রান্ত না হয় তার জন্য তাদের সর্তক করে দেওয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করি। [...] আমি এতদিন পর্যন্ত সহানুভূতি ও উদারতার সঙ্গে এইসব প্রশ্নের বিবেচনা করেছি। [...] আমার এই মনোভাবকে সরকারের পক্ষে দুর্বলতা বলে ভুল করা হয়েছে। [...] যারা [...] আগুন নিয়ে খেলা করছে তাদের আমি সাবধান করে দিতে চাই যে, সরকার কখনোই অরাজকতা বরদাশ্‌ত করবে না।[৯০]

১৬ই মার্চ ১৯৪৮ (রাত), সংগ্রাম পরিষদের একটি বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিশেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১৭ই মার্চ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হবে। ১৭ই মার্চ ১৯৪৮, ঢাকার সবগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। নঈমুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়, এবং এখানে জিন্নাহ্‌র ঢাকা-সফর উপলক্ষে ধর্মঘট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিকালে নঈমুদ্দীন ও তাজুদ্দীনের উপর সরকারের একদল ভাড়াটি সন্ত্রাসীরা আতুঙ্ক হামলা চালায়, মতি সর্দারের সহায়তায় তারা রক্ষা পান। সারাদিন ধরেই চলে সভা, মিছিল, পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদুনে-গ্যাস নিক্ষেপ; একইসঙ্গে ফাঁকা-গুলির আওয়াজে ঢাকা শহর প্রকম্পিত হতে থাকে। ১৭ই মার্চ (রাত) ও ১৮ই মার্চ (দিন), ফজলুল হক হলের হাউস টিউটর মাজহারুল হকের ঘরে সংগ্রাম পরিষদের একের-পর-এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসব বৈঠকে ১৬ই মার্চের অনুষ্ঠিত ঘটনার একটি ব্যাখ্যামূলক বিবৃতির খসড়া তৈরি ও জিন্নাহকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য 'ছাত্রসম্বর্ধনা কমিটি' গঠন করা হয়।

জিন্নাহ'র ঢাকা সফর

১৮ই মার্চ ১৯৪৮, জিন্নাহর ঢাকা-আগমণ উপলক্ষে মুসলিম লীগ সদস্যদের নেতৃত্বে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে সিরাজউদ্দৌলা-মীরমদন-মোহলাল নামে তোরণ নির্মাণ করা হয়। ১৯শে মার্চ ১৯৪৮, জিন্নাহ তেজগাঁও বিমানবন্দরে পৌঁছলে আতশবাজি ফুটিয়ে তাকে নাগরিক-সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য বিমান-বন্দরে সমবেত হয় হাজার হাজার লোক, আর তেজগাঁ থেকে রেসকোর্সের ময়দান পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে জিন্নাহর দর্শনলাভের জন্য অসংখ্য জনতা অপেক্ষায় থাকে।[৯১]

২১শে মার্চ ১৯৪৮, রেসকোর্স ময়দানে নাগরিক-সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে জিন্নাহ তার এক ঘণ্টার ভাষণে পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তার ভাষণে বলেন,

> I am grateful to the people of this province and, through you Mr. Chairman of the Reception Committee, to the people of Dhaka, for the great welcome that they have accorded to me. I need hardly say that it gives me the greatest pleasure to visit East Bengal. East Bengal is the most important component of Pakistan, inhabited as it is by the largest single block of

[৯০] দৈনিক আজাদ, ১৮ই মার্চ ১৯৪৮।
[৯১] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১৯৭০।

Muslims in the world. I have been anxious to pay this province an early visit, but unfortunately, other matters of greater importance had so far prevented me from doing so.

About some of these important matters, you doubtless know. You know, for instance, of the cataclysm that shook the Punjab immediately after partition, and of the millions of Muslims who in consequence were uprooted from their homes in East Punjab, Delhi and neighboring districts and had to be protected, sheltered and fed pending rehabilitation in Western Pakistan. Never throughout history was a new State called upon to face such tremendous problems. Never throughout history has a new State handled them with such competence and courage. Our enemies had hoped to kill Pakistan at its inception. Pakistan has, on the contrary, arisen triumphant and stronger than ever. It has come to stay, and play its great role for which it is destined.

In your address of welcome you have stressed the importance of developing the great agricultural and industrial resources of this province, of providing facilities for the training of the young men and women of this province for entering the Armed Forces of Pakistan, of the development of the port of Chittagong and of communications between this province and other parts of Pakistan, of development of educational facilities and finally you have stressed the importance of ensuring that the citizens of Eastern Pakistan get their due and legitimate share in all spheres of government activity. Let me at once assure you that my government attaches the greatest importance to these matters and is anxiously and constantly engaged in ensuring that Eastern Pakistan attains it full stature with the maximum of speed. Of the martial powers of the people of this province, history provides ample evidence and as you are aware, Government has already taken energetic steps to provide facilities for the training of the youth of this province both in the regular Armed Forces and as volunteers in the Pakistan National Guards. You may rest assured that the fullest provision shall be made for enabling the youth of this province to play its part in the defense of this State.

Let me now turn to some general matters concerning this province. In doing so, let me first congratulate you, the people of this province and your Government, over the manner in which you have conducted yourselves during these seven months of trials and tribulations. Your Government and loyal, hardworking officials deserve to be congratulated on the speed and efficiency with which it succeeded in building up an ordered administration out of the chaos and confusion which prevailed immediately after partition. On the 15th August, the Provincial Government in Dhaka was a fugitive in its own home. It was faced with the immediate problem of finding accommodation for the thousands of Government personnel in what was, after all, before partition only small mofussil town. Hardly had government got to grips with administrative problems thus created when some seventy thousands Railway and other personnel and their families suddenly arrived in this province, driven out of India partly by panic owing to the disturbances immediately following the partition. There were further, owing to the wholesale departure of Hindu personnel, great gaps left in the administrative machinery and the entire transport and communication system had been disorganized. The immediate task that faced the Government, therefore, was hurriedly to re-group its forces and reorganize its administrative machine in order to avert an imminent administrative collapse.

This Government did with extraordinary speed and efficiency. The administration continued to function unhampered, and the life of the community continued undisturbed. Not only was the administration speedily reorganized but also the great administrative shortages were quickly made good, so that an impending famine was averted, and what is equally important, peace was maintained throughout the province. In this latter respect, much credit is due also to the people of this province, in particular to the members of the majority community, who showed exemplary calm and determination to maintain peace despite the great provocation afforded by the massacre and oppression of the Muslims in the Indian Dominion in the months immediately after partition. Despite those horrible happenings, some forty thousand processions were taken out by the Hindu community during the last Puja in this province without a single instance of the breach of peace, and without any molestation from the Muslims of this province.

Any impartial observer will agree with me that throughout these troubles the minorities were looked after and protected in Pakistan better than anywhere else in India. You will agree that Pakistan was able to keep peace and maintain law and order; and let me tell you that the minorities not only here in Dhaka but throughout Pakistan are more secure, more safe than anywhere else. We have made it clear that the Pakistan Government will not allow peace to be disturbed; Pakistan will maintain law and order at any cost; and it will not allow any kind of mob rule. It is necessary to draw attention to these facts, namely, the building up of an orderly administration, the averting of an imminent famine and the maintenance of the supply of food to some forty million people in this province at a time of overall food shortage and serious administrative difficulties, and the maintenance of peace, because there is a tendency to ignore these achievements of the Government and to take these things for granted.

It is always easy to criticize, it is always easy to go on fault-finding, but people forget the things that are being done and are going to be done for them, and generally they take those for granted without even realizing as to what trials, tribulations, difficulties and dangers we had to face at the birth of Pakistan. I do not think that your administration is perfect, far from it, I do not say that there is no room for improvement; I do not say that honest criticism from true Pakistanis is unwelcome. It is always welcome. But when I find in some quarters nothing but complaint, fault-finding and not a word of recognition as to the work that has been done either by your Government or by those loyal officials and officers who have been working for you day and night it naturally pains me. Therefore, at least say some good word for the good that is done, and then complain and criticize. In a large administration, it is obvious that mistakes must be made; you cannot expect that it should be faultless; no country in the world can be so. But our ambition and our desire are that it should be as little defective as possible. Our desire is to make it more efficient, more beneficial, more smooth working. For what? What has the Government got for its aim? The Government can only have for its aim one objective – how to serve the people, how to devise ways and means of their welfare, for their betterment. What other object can the Government have and remember; now it is in your hands to put the Government in power or remove the Government from power; but you must not do it by mob methods. You have the power; you must learn the art to use it; you must try and understand the machinery. Constitutionally, it is in your hands to upset one Government and put another Government in power if you are dissatisfied to such an extent.

Therefore, the whole thing is in your hands, but I advise you strongly to have patience and to support the men who are at the help of your Government, sympathize with them, try and understand their troubles and their difficulties just as they should try and understand your grievances and complaints and sufferings. It is by that co-operation and that good spirit and goodwill that you will be able not only to preserve Pakistan, which we have achieved but also, make it a great State in the world. Are you now, after having achieved Pakistan, going to destroy it by your own folly? Do you want to build it up? Well then for that purpose there is one essential condition, and it is this complete unity and solidarity amongst us.

But I want to tell you that in our midst there are people financed by foreign agencies who are intent on creating disruption. Their object is to disrupt and sabotage Pakistan. I want you to be on your guard; I want you to be vigilant and not to be taken in by attractive slogans and catchwords. They say that Pakistan Government and the East Bengal Government are out to destroy your language. A bigger falsehood was never uttered by a man. Quite frankly and openly I must tell you that you have got amongst you a few communists and other agents financed by foreign help and if you are not careful, you will be disrupted. The idea that East Bengal should be brought back into the Indian Union is not given up, and it is their aim yet, and I am confident – I am not afraid, but it is better to be vigilant – that those people who still dream of getting back East Bengal into the Indian Union are living in a dream-land.

I am told that there has been some exodus of the Hindu community from this province. I have seen the magnitude of this exodus put at the fantastic figure of ten lakes in the Indian Press. Official estimates would not put the figure beyond two lakhs at the utmost. In any case, I am satisfied that such exodus, as has taken place has been the result not of any ill treatment of the minority communities. On the other hand, the minority communities have enjoyed, and

rightly so, greater freedom, and have been shown greater solicitude for their welfare than the minorities in any part of the Indian Dominion.

The cause of this exodus are to be found rather in the loose talk by some war-mongering leaders in the Indian Dominion of the inevitability of war between Pakistan and India; in the ill-treatment of the minorities in some of the Indian provinces and the fear among the minorities of the likely repercussions of that ill-treatment here, and in the open encouragement to Hindus to leave this province being sedulously given by a section of the Indian Press, producing imaginary accounts or what it calls the plight of the minorities in Pakistan, and by the Hindu Mahasabha. All this propaganda and accusations about the ill-treatment of the minorities stand belied by the fact that over twelve million non-Muslims continue to live in this province in peace and have refused to migrate from here.

Let me take this opportunity of repeating what I have already said: we shall treat the minorities in Pakistan fairly and justly. Their lives and property in Pakistan are far more secure and protected than in India and we shall maintain peace, law and order and protect and safeguard fully every citizen of Pakistan without distinction of caste, creed or community.

So far so good. Let me now turn to some of the less satisfactory features of the conditions in this province. There is a certain feeling, I am told, in some parts of this province, against non-Bengali Muslims. There has also lately been a certain amount of excitement over the question whether Bengali or Urdu shall be the State language of this province and of Pakistan. In this latter connection, I hear that some discreditable attempts have been made by political opportunities to make a tool of the student community in Dhaka to embarrass the administration

My young friends, students who are present here, Let me tell you as one who has always had love and affection for you, who has served you for ten years faithfully and loyally, let me give you this word of warning: you will be making the greatest mistake if you allow yourself to be exploited by one political party or another. Remember, there has been a revolutionary change. It is our own Government. We are a free, independent and sovereign State. Let us behave and regulate our affairs as free men; we are not suppressed and oppressed under the regime of a foreign domination; we have broken those chains, we have thrown off those shackles. My young friends, I look forward to you as the real makers of Pakistan, do not be exploited and do not be misled. Create amongst yourselves complete unity and solidarity. Set an example of what youth can do. Your main occupation should be – in fairness to yourself, in fairness to your parents, in fairness to the State to devote your attention to your studies. If you fritter away your energies now, you will always regret. After you leave the portals of your universities and colleges taken you, can play your part freely and help yourself and the State. Let me warn you in the clearest term of the dangers that still face Pakistan and your province in particular as I have done already. Having failed to prevent the establishment of Pakistan, thwarted and frustrated by their failure, the enemies of Pakistan have now turned their attention to disrupt the State by creating a split amongst the Muslims of Pakistan. These attempts have taken the shape principally of encouraging provincialism.

As long as you do not throw off this poison in our body politic, you will never be able to weld yourself, mould yourself, galvanise yourself into a real true nation. What we want is not to talk about Bengali, Punjabi Sindhi, Baluchi, Pathan and so on. They are of course units. But I ask: have you forgotten the lesson that was taught to us thirteen hundred years ago? If I may point out, you are all outsiders here. Who were the original inhabitants of Bengal not those who are now living. So what is the use of saying "we are Bengalis, or Sindhis, or Pathans, or Punjabi". No, we are Muslims.

Islam has taught us this, and I think you will agree with me that whatever else you may be and whatever you are, you are a Muslim. You belong to a Nation now; you have now carved out a territory, vast territory, it is all yours; it does not belong to a Punjabi or a Sindhi, or a Pathan, or a Bengali; it is yours. You have got your Central Government where several units are represented. Therefore, if you want to build up yourself into a Nation, for God's sake give

up this provincialism. Provincialism has been one of the curses; and so is sectionalism – Shia, Sunni, etc.

It was no concern of our predecessor Government; it was no concern of theirs to worry about it; they were here to carry on the administration, maintain law and order and to carry on their trade and exploit India as much as they could. But now we are in a different position altogether. Now I give you an example. Take America. When it threw off British rule and declared itself independent, how many nations were there? It had many races: Spaniards, French, Germans, Italians, English, Dutch and many more. Well, there they were. They had many difficulties. But mind you, their nations were actually in existence and they were great nations; whereas you had nothing. You have got Pakistan only now. But there a Frenchman could say 'I am a Frenchman and belong to a great nation', and so on. But what happened? They understood and they realized their difficulties because they had sense, and within a very short time they solved their problems and destroyed all this sectionalism, and they were able to speak not as a German or a Frenchman or an Englishman or a Spaniard, but as Americans. They spoke in this spirit: 'I am an American' and we are Americans'. Andso you should think, live and act in terms that your country is Pakistan and you are a Pakistani.

Now I ask you to get rid of this provincialism, because as long as you allow this poison to remain in the body politic of Pakistan, believe me, you will never be a strong nation, and you will never be able to achieve what I wish we could achieve. Please do not think that I do not appreciate the position. Very often it becomes a vicious circle. When you speak to a Bengali, he says: 'Yes you are right, but the Punjabi is so arrogant'; when you speak to the Punjabi or non-Bengali, he says, 'Yes but these people do not want us here, they want to get us out'. Now this is a vicious circle, and I do not think anybody can solve this Chinese puzzle. The question is, who is going to be more sensible, more practical, and more statesmanlike and will be rendering the greatest service to Pakistan? So make up your mind and from today put an end to this sectionalism.

About language, as I have already said, this is in order to create disruption amongst the Mussalmans. Your Prime Minister has rightly pointed this out in a recent statement and I am glad that his Government has decided to put down firmly any attempt to disturb the peace of this province by political saboteurs, their agents. Whether Bengali shall be official language of this province is a matter for the elected representatives of the people of this province to decide. I have no doubt that this question shall be decided solely in accordance with the wishes of the inhabitants 'of this province at the appropriate time.

Let me tell you in the clearest language that there is no truth that your normal life is going to be touched or disturbed so far as your Bengali language is concerned. But ultimately it is for you, the people of this province, to decide what shall be the language of your province. But let me make it very clear to you that the State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. Anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. Without one State language, no Nation can remain tied up solidly together and function. Look at the history of other countries. Therefore, so far as the State Language is concerned, Pakistani language shall be Urdu. But, as I have said, it will come in time.

I tell you once again, do not fall into the trap of those who are the enemies of Pakistan. Unfortunately, you have fifth columnists – and I am sorry to say they are Muslims – who are financed by outsiders. But they are making a great mistake. We are not going to tolerate sabotage any more; we are not going to tolerate the enemies of Pakistan; we are not going to tolerate quislings and fifth-columnists in our State, and if this is not stopped, I am confident that your Government and the Pakistan Government will take the strongest measures and deal with them ruthlessly, because they are a poison. I can quite understand differences of views. Very often it is said, why cannot we have this party or that party? Now let me tell you, and I hope you will agree with me, that we have as a result of unceasing effort and struggle ultimately achieved Pakistan after ten years. It is the Muslim League, which has done it. There were of course many Massalmans who were indifferent; some were afraid, because they had vested interests and they thought they might lose some sold themselves to the

enemy and worked against us, but we struggled and we fought and by the grace of God and with His help we have established Pakistan which has stunned the World.

Now this is a sacred trust in your hands, i.e., the Muslim League. Is this sacred trust to be guarded by us as the real custodians of the welfare of our country and our people, or not? Are mushroom parties led by men of doubtful past to be started to destroy what we have achieved or capture what we have secured? I ask you one question. Do you believe in Pakistan? Are you happy that you have achieved Pakistan? Do you want East Bengal or any part of Pakistan to go into the Indian Union? Well, if you are going to serve Pakistan, if you are going to build up Pakistan, if you are going to reconstruct Pakistan, then I say that the honest course open to every Mussalman is to join the Muslim League Party and serve Pakistan to the best of his ability. Any other mushroom parties that are started at present will be looked upon with suspicion because of there past, not that we have any feeling of malice, ill will, or revenge. Honest change is welcome, but the present emergency requires that every Mussalman should come under the banner of the Muslim League, which is the true custodian of Pakistan, and build it up and make it a great State before we think of parties amongst ourselves which may be formed later on sound and healthy lines.

Just one thing more. Do not feel isolated. Many people have spoken to me that East Bengal feels isolated from the rest of Pakistan. No doubt there is a great distance separating the East from the West Pakistan; no doubt there are difficulties, but I tell you that we fully know and realize the importance of Dhaka and East Bengal. I have only come here for a week or ten days this time, but in order to discharge my duty as the Head of the State I may have to come here and stay for days, for weeks, and similarly the Pakistan Ministers must establish closer contact. They should come here and your leaders and members of your Government should go to Karachi, which is the capital of Pakistan. But you must have patience. With your help and with your support we will make Pakistan a mighty State.

Finally, let me appeal to you to keep together, put up with inconveniences, sufferings and sacrifices, for the collective good of our people. No amount of troubles, no amount of hard work or sacrifice contribution for the collective good of your nation and your State. It is in that way, that you will build up Pakistan as the fifth largest State in the world, not only in population as it is but also in strength, so that it will command the respect of all the other nations of the world. With these words I wish you God speed.[92]

জিন্নাহর ভাষণ শেষ হওয়া মাত্রই, বাঙালি-জানতা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। জিন্নাহ তার বক্তৃতায় ভাষা সম্পর্কে বিবিধ মন্তব্য প্রকাশ ও রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সর্তক-সাবধানবাণী উচ্চারণ করলে ফজলুল হকও নীরব থাকতে পারেননি, তিনি ২৩শে মার্চ, একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলেন যে, জিন্নাহ দুর্ভিক্ষের সময় বা সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের সময় ঢাকায় আসেননি। এখন কেন এসেছেন? সরকারি-কর্মচারীবৃন্দ কায়েদে আজমকে ভুল সংবাদ দিয়েছে, ফলে তিনি ভিত্তিহীন বিবৃতি প্রকাশ এবং বর্তমান মন্ত্রিসভার কার্যকারিতার উচ্চপ্রশংসা করেছেন। কায়েদে আজম বর্তমান মন্ত্রিসভাকে যে সার্টিফিকেট দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কায়েদে আজম কুইসলিং, পঞ্চমবাহিনী ও রাষ্ট্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে বজ্রনির্ঘোষে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু পাকিস্তানে তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। মন্ত্রীগণ জনসাধারণের আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। মন্ত্রীগণ পাকিস্তানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসানের জন্য কিছুই করেনি, এমনকী পাকিস্তানের আদালতের ভাষারূপে অবিলম্বে বাংলা ভাষার প্রবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থার অবহেলা করে চলেছে, অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, মন্ত্রিসভার অপদার্থতা সত্ত্বেও কায়েদে আজম তাদের উপযুক্ত বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। কায়েদে আজম উর্দুকে পাকিস্তানের

[92] Jinnah's Speech at a public meeting at Dhaka on 21st March 1948.

সরকারি ভাষা বলে ঘোষণা করেছেন, তা প্রতিহিংসামূলক, স্বৈরাচার। সরকারি ভাষা কী হবে তা ঘোষণা করা গভর্নর জেনারেলের কাজ নয়, জনসাধারণই তা স্থির করবে।[৯৩]

২৪শে মার্চ ১৯৪৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ছাত্রদের উদ্যোগে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ, একটি দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে, বলেন,

> Mr. Chancellor, Ladies and Gentlemen,
>
> When I was approached by the vice-chancellor with a request to deliver the Convocation Address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possible prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which University deals, such as arts, history, philosophy, science, law and so on. I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion, and it is in fulfillment of that promise that I will address you now.
>
> First of all, let me thank the vice-chancellor for the flattering terms in which he referred to me. Mr. vice-chancellor, whatever I am, and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty which is incumbent upon every Mussalman to serve his people honestly and selflessly.
>
> In addressing you I am not here speaking to you as Head of the State, but as a friend, and as one who has always held you in affection. Many of you have today got your diplomas and degrees and I congratulate you. Just as you have won the laurels in your University and qualified yourselves, so I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. Many of you have come to the end of your scholastic career and stand at the threshold of life. Unlike your predecessors, you fortunately leave this University to enter life under a sovereign, Independent State of your own. It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. We have broken the shackles of slavery; we are now a free people. Our State is our own State. Our Government is our own Government, of the people, responsible to the people of the State and working for the good of the State. Freedom, however, does not mean license. It does not mean that you can now behave just as you please and do what you like, irrespective of the interests of other people or of the State. A great responsibility rests on you and, on the contrary, now more than ever, it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. What are now required of us all is constructive spirit and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a Government. Let me tell you something of the difficulties that we have overcome and of the dangers that still lie ahead. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. Thus, hardly had the new State come into being when came the Punjab and Delhi holocaust. Thousand of men, women and children were mercilessly butchered and millions were uprooted from their homes. Over fifty lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees, stricken in body and in soul, presented problems, which might well have destroyed many a well-established State. But those of our enemies who had hoped to kill Pakistan at its very inception by these means were disappointed. Not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, but also it has emerged stronger, more chastened and better equipped than ever.
>
> There followed in rapid succession other difficulties, such as withholding by India of our cash balances, of our share of military equipment and lately, the institution of an almost complete economic blockade of your Province. I have no doubt that all right-thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change, but it is essential that you should take note of these

[৯৩] দৈনিক আজাদ, ২৫শে মার্চ ১৯৪৮।

developments. They stress the importance of continued vigilance on our part. Of late, they attack on your province, particularly, has taken a subtler form. Our enemies, among whom I regret to say, there are some Muslims, have set about actively encouraging provincialism in the hope of weakening Pakistan and thereby facilitating the re-absorption of this province into the Indian Dominion. Those who are playing this game are living in a Fool's Paradise, but this does not prevent them from trying. A flood of a false propaganda is being daily put forth with the object of undermining the solidarity of the Musslamans of this State and inciting the people to commit acts of lawlessness. The recent language controversy, in which I am sorry to make note, some of you allowed yourselves to get involved even after your Prime Minister had clarified the position, is only one of the many subtle ways whereby the poison of provincialism is being sedulously injected into this province. Does it not strike you rather odd that certain sections of the Indian press to whom the very name of Pakistan is anathema, should in the matter of language controversy set themselves up as the champion of what they call your just rights? Is it not significant that the very persons who in the past have betrayed the Mussalmans or fought against Pakistan, which is after all merely the embodiment of your fundamental right of self-determination, should now suddenly pose as the saviors of your just right and incite you to defy the Government on the question of language? I must warn you to beware of these fifth columnists. Let me restate my views on the question of a State language for Pakistan. For official use in this province, the people of the province can choose any language they wish. This question will be decided solely in accordance with the wishes of the people of this province alone, as freely expressed through their accredited representatives at the appropriate time and after full and dispassionate consideration. There can, however, be only one lingua franca, that is, the language for intercommunication between the various provinces of the State, and that language, should be Urdu and cannot be any other. The State language therefore, must obviously be Urdu, a language that has been nurtured by a hundred million Muslims of this sub-continent, a language understood throughout the length and breadth of Pakistan and above all a language which, more than any other provincial language, embodies the best that is in Islamic culture and Muslim tradition and is nearest to the language used in other Islamic countries. It is not without significance that Urdu has been driven out of the Indian Union and that even the official use of the Urdu script has been disallowed. These facts are fully known to the people who are trying to exploit the language controversy in order to stir up trouble. There was no justification for agitation but it did not suit their purpose to admit this. Their sole object in exploiting this controversy is to create a split among the Muslims of this State, as indeed they have made no secret of their efforts to incite hatred against non-Bengali Mussalmans. Realizing, however, that the statement that your Prime Minister made on the language controversy, on return from Karachi, left no room for agitation, in so far as it conceded the right of the people of this province to choose Bengali as their official language if they so wished, these persons changed their tactics. They started demanding that Bengali should be the State language of the Pakistan Center and since they could not overlook the obvious claims of Urdu as the official language of a Muslim State, they proceeded to demand that both Bengali and Urdu should be State languages of Pakistan. Make no mistake about it. There can be only one State language, if the component parts of this State are to march forward in unison, and that language in my opinion can only be Urdu. I have spoken at some length on this subject so as to warn you of the kind of tactics adopted by the enemies of Pakistan and certain opportunist politicians to try to disrupt this State or to discredit the Government. Those of you, who are about to enter life, be on your guard against these people. Those of you who have still to continue your studies for sometime, do not allow yourselves to be exploited by any political party or self-seeking politician. As I said the other day, your main occupation should be in fairness to yourselves, in fairness to your parents and indeed in fairness to the State, to devote your attention solely to your studies. It is only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you. Only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your State. Only thus, can you assist it in solving the great social and economic problems that confront it and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nations of the world.

My young friends, I would, therefore, like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. Firstly, beware of the fifth columnists among ourselves. Secondly, guard against and weed out selfish people who only wish to exploit you so that they may swim. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and UN-selfish servants of the State who wish to serve the people with heart and soul and support them. Fourthly, consolidate the Muslim League Party, which will serve and build up a really and truly great and glorious Pakistan. Fifthly, the Muslim League has won and established Pakistan and it is the Muslim League whose duty it is now, as custodian of the sacred trust, to construct Pakistan. Sixthly, there may be many who did not lift their fingers to help us in our struggle, nay even opposed us and put obstacle in our great struggle openly and not a few worked in our enemy's camp against us, who may now come forward and put their own attractive slogans, catch-words, ideals and programs before you. But they have yet to prove their bonafides or that there has really been an honest change of heart in them, by supporting and joining the League and working and pressing their views within the League Party organization and not by starting mushroom parties, at this juncture of very great and grave emergency when you know that we are facing external dangers and are called upon to deal with internal complex problems of a far-reaching character affecting the future of seventy millions of people. All this demands complete solidarity, unity and discipline. I assure you, "Divided you fall. United you stand".

There is another matter that I would like to refer to. My young friends, hitherto, you have been following the rut. You get your degrees and when you are thrown out of this University in thousands, all that you think and hanker for is Government service. As your vice-chancellor has rightly stated the main object of the old system of education and the system of Government existing, hitherto, was really to have well-trained, well-equipped clerks. Of course, some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well-qualified clerks. Civil Service was mainly staffed by the Britons and the Indian element was introduced later on and it went up progressively. Well, the whole principle was to create a mentality, a psychology, and a state of mind that an average man, when he passed his B.A. or M.A. was to look for some job in Government. If he had it he thought he had reached his height. I know and you all know what has been really the result of this. Our experience has shown that an M.A. earns less than a taxi driver, and most of the so-called Government servants are living in a more miserable manner than many menial servants who are employed by well to do people. Now I want you to get out of that rut and that mentality and specially now that we are in free Pakistan. Government cannot absorb thousand impossible. But in the competition to get Government service most of you demoralized. Government can take only a certain number and the rest cannot settle down to anything else and being disgruntled are always ready to be exploited by persons who have their own axes to grind. Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels and other avenues and fields that are open to you and will increasingly become so. There is no shame in doing manual work and labor. There is an immense scope in technical education for we want technically qualified people very badly. You can learn banking, commerce, trade, law, etc., which provide so many opportunities now. Already you find that new industries are being started, new banks, new insurance companies, new commercial firms are opening and they will grow as you go on. Now these are avenues and fields open to you. Think of them and divert your attention to them, and believe me, you will there benefit yourselves more than by merely going in for Government service and remaining there, in what I should say, a circle of clerkship, working there from morning till evening, in most dingy and uncomfortable conditions. You will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry and will thus be helping not only yourselves but also your State. I can give you one instance. I know a young man who was in Government service. Four years ago he went into a banking corporation on two hundred rupees, because he had studied the subject of banking and today he is Manager in one of their firms and drawing fifteen hundred rupees a month – in just four years. These are the opportunities to have and I do impress upon you now to think in these terms.

> Finally, I thank you again Mr. Chancellor and particularly you Mr. vice-chancellor for the warm welcome you have given me and the very flattering personal references made by you. I hope, nay I am confident that the East Bengal youth will not fail us.[94]

জিন্নাহর বক্তব্য– 'Make no mistake about it. There can be only one State language, if the component parts of this State are to march forward in unison, and that language in my opinion can only be Urdu'– প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কার্জেন হলে অবস্থানরত ছাত্ররা 'নো নো' শব্দের মাধ্যমে প্রতিবাদ প্রকাশ করে।

২৪শে মার্চ ১৯৪৮ (সন্ধ্যা), শামসুল হকের নেতৃত্বে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর একটি প্রতিনিধিদল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানাতে জিন্নাহর সঙ্গে দেখা করেন। শামসুল হক, কমরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাসেম, তাজুদ্দীন, লিলি খান, মুহম্মদ তোয়াহ, আজিজ আহমদ, অলি আহাদ, নঈমুদ্দীন আহমদ, শামসুল আলম ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম যুক্তি ও আলোচনার মাধ্যমে জিন্নাহকে বাংলা ভাষার দাবী মেনে নিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি তার ঘোষণায় অটল থাকেন, যদিও তিনি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে কোনো বলিষ্ঠ যুক্তি প্রদান করতে সক্ষম হননি। অবশেষে বাংলাকে সরাসরি অগ্রাহ্য করতে না পেরে তিনি বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হবে কী না এ-ব্যাপারে গণপরিষদে যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অঙ্গীকারে অবদ্ধ হয়ে প্রসঙ্গটির ইতি টানেন। জিন্নাহকে অবশ্য 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর প্রতিনিধি দল একটি স্মরকলিপি প্রদান করেন, এতে বলা হয়,

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের একমাত্র মুসলমান যুবকদের লইয়া গঠিত এই কর্মপরিষদ মনে করেন যে, বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কারণ– প্রথমত, তাঁহারা মনে করেন যে, উহা পাকিস্তানের সমগ্র জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের ভাষা এবং পাকিস্তান জনগণের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার অধিকাংশ লোকের দাবী মানিয়া লওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, আধুনিক যুগে কোনো কোনো রাষ্ট্রে একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিশেবে গৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত কয়েকটি দেশের নাম করা যায়: বেলজিয়াম (ফ্লেমিং ও ফরাসী ভাষা), কানাডা (ইংরেজি ও ফরাসী ভাষা), সুইজারল্যান্ড (ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয় ভাষা), দক্ষিণ আফ্রিকা (ইংরেজি ও আফ্রিকানার ভাষা), মিসর (ফরাসী ও আরবি ভাষা), শ্যাম (থাই ও ইংরেজি ভাষা)। এতদ্ব্যতীত সোভিয়েট রাশিয়া ১৭টি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিশেবে গ্রহণ করিয়াছে। তৃতীয়ত, এই ডোমিনিয়নের সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে একমাত্র বাংলা ভাষাই রাষ্ট্রভাষার স্থান অধিকার করার পক্ষে উপযুক্ত। কারণ সম্পদের দিক বিবেচনায় এই ভাষাকে পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম স্থান দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থত, আলাওল, নজরুল ইসলাম, কায়কোবাদ, সৈয়দ এমদাদ আলী, ওয়াজেদ আলী, জসিমউদ্দীন ও আরো অনেক মুসলমান কবি ও সাহিত্যিক তাঁহাদের রচনাসম্ভার দ্বারা এই ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। পঞ্চমত, বাংলার সুলতান হুসেন শাহ সংস্কৃতভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও এই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিলেন। এবং এই ভাষার শব্দ সম্পদের মধ্যে শতকরা ৫০ভাগ ফারসি ও আরবি ভাষা হইতে গৃহীত। [...] যে কোনো পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক নাগরিকের কয়েকটি মৌলিক অধিকার আছে। কাজেই যে-পর্যন্ত না আমাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সে-পর্যন্ত বাংলা ভাষার জন্য এই আন্দোলন চালাইয়া যাওয়া হইবে।[৯৫]

২৮শে মার্চ ১৯৪৮, করাচির উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বে পাকিস্তান বেতারকেন্দ্র ঢাকা থেকে একটি দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে জিন্নাহ তাঁর পূর্বকার মন্তব্যগুলি পুনরাবৃত্তি করে বলেন,

> During the past nine days that I have spent in your province, I have been studying your local conditions and some of the problems that confront east Bengal. Tonight, on the eve of my departure, I want to place before you some of my impressions. Before I do this, however, let me first cordially thank you for the great warmth and affection with which you have received me everywhere in your midst during my stay here.

[94] Jinnah's Speech at the Dhaka University Convocation on 24th March 1948.
[৯৫] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১৯৭০।

From the administrative point of view, East Bengal perhaps more than any other province of Pakistan, has had to face the most difficult problems as a result of Partition. Before August 14, it existed merely as a hinterland to Calcutta, to whose prosperity it greatly contributed but which it did not share. On August 14, Dhaka was merely a mofussil town, having none of the complex facilities and amenities, which are essential for the capital of a modern Government. Further, owing to partition, the province's transport system had been thrown completely out of gear and the administrative machinery seriously disorganised at a time when the country was threatened with a serious food shortage. The new province of East Bengal thus came into being in the most unfavourable circumstances, which might easily have proved fatal to a less determined and less tenacious people. That the administration not only survived but even emerged stronger from such setbacks as the Chittagong cyclone, is a striking tribute both to the sterling character of the people as well as to the unremitting zeal of the Government of the province. The position now is that the initial difficulties have to a great extent been overcome and, though there is no ground for complacency, there are at least reasons for quiet confidence in the future. Though now undeveloped, East Bengal possesses vast potentialities of raw materials and hydroelectric power. In Chittagong you have the making of a first-class port which in time should rank among the finest ports in the world. Given peaceful conditions and the fullest co-operation from all sections of the people, we shall make this province the most prosperous in Pakistan.

It is a matter for congratulation that despite the massacre and persecution of Muslims in the Indian Domination in the months immediately following Partition, peaceful conditions have throughout prevailed in this province, and I have seen the minority community going about its normal day-to-day vocations in perfect security. Some migration of Hindus to the Indian Dominion, there unfortunately has been, though the estimates mentioned in the Indian press are ridiculous. I am satisfied, at any rate, that whatever movement there has been, has not in any way been due to their treatment here, which under the circumstances has been exemplary, but rather to psychological reasons and external pressure. Indian leaders and a section of the Indian press have indulged freely in war-mongering talks against Pakistan. There has been persistently insidious propaganda by parties like the Hindu Mahasabha in favour of an exchange of population: and disturbances in the Indian Dominion, in which Muslims have been persecuted; have not unnaturally given rise to fears in the mind of the minority community lest unpleasant repercussions should occur in East Bengal, even though such apprehensions have no foundation for they have been belied by actual facts. Over and above all these factors, the recent declaration by the Indian Dominion on Pakistan as a foreign country for customs and other purposes has involved the Hindu business community in serious economic difficulties and brought pressure to bear on many Hindu businessmen to remove their business to the Indian Dominion. I find that the Provincial Government have repeatedly given assurances and have at all times taken whatever steps were possible for the protection and well being of the minority community and have done their best to dissuade them from leaving their ancestral homes in East Bengal for an unknown fate in the Indian Union.

I would like now to offer a word of advice to the people of this-province. I notice a regrettable tendency on the part of a certain section of the people to regard their newly won freedom, not as liberty with the great opportunities it opens up and the heavy responsibilities it imposes, but as licence. It is true that, with the removal of foreign domination, the people are now the final arbiters of their destiny. They have perfect liberty to have by constitutional means any Government that they may chose. This cannot, however, mean that any group may now attempt by any unlawful methods to impose its will on the popularly elected Government of the day. The Government and its policy may be changed by the votes of the elected representatives of the Provincial Legislative Assembly. Not only that, but no Government worthy of the name can for a moment tolerate such gangsterism and mob rule from reckless and irresponsible people, but must deal with it firmly by all the means at its disposal. I am thinking particularly of the language controversy, which has caused quite unnecessary excitement and trouble in certain quarters in this province; and if not checked, it

might lead to serious consequences. What should be the official language of this province is for your representatives to decide.

But this language controversy is really only one aspect of a bigger problem – that of provincialism. I am sure you must realize that in a newly-formed State like Pakistan, consisting moreover as it does of two widely separated parts, cohesion and solidarity amongst all its citizens, from whatever part they may come, is essential for its progress, nay for its very survival. Pakistan is the embodiment of the unity of the Muslim nation and so it must remain. That unity we, as true Muslims, must jealously guard and preserve. If we begin to think of ourselves as Bengalis, Punjabis, Sindhis etc. first and Muslims and Pakistanis only incidentally, then Pakistan is bound to disintegrate. Do not think that this is some abstruse proposition: our enemies are fully alive to its possibilities, which I must warn you they are already busy exploiting. I would ask you plainly, when political agencies and organs of the Indian press, which fought tooth and nail to prevent the creation of Pakistan, are suddenly found with a tender conscience for what they call the 'just claims' of the Muslims of East Bengal, do you not consider this a most sinister phenomenon? Is it not perfectly obvious that, having failed to prevent the Muslims from achieving Pakistan, these agencies are now trying to disrupt Pakistan from within by insidious propaganda aimed at setting brother Muslim against brother Muslim? That is why I want you to be on your guard against this poison of provincialism that our enemies wish to inject into our State. There are great tasks to be accomplished and great dangers to be overcome: overcome them we certainly shall but we shall do so much quicker if our solidarity remains unimpaired and if our determination to march forward as a single, united nation remains unshaken. This is the only way in which we can raise Pakistan rapidly and surely to its proper, worthy place in the comity of nations.

Here I would like to address a word to the women of East Pakistan. In the great task of building the nation and maintaining its solidarity women have a most valuable part to play, as the prime architects of the character of the youth that constitute its backbone, not merely in their own homes but by helping their less fortunate sisters outside in that great task. I know that in the long struggle for the achievement of Pakistan, Muslim women have stood solidly behind their men. In the bigger struggle for the building up of Pakistan that now lies ahead, let it not be said that the women of Pakistan had lagged behind or failed in their duty.

Finally, I would address a special word to Government servants, both Central and Provincial – that great body of pioneers, many of whom have been working under very difficult conditions in this province. Yours is a great responsibility. You must ensure that this province is given, not merely the ordinary routine services that you are bound to perform, but rather the very last ounce of selfless endeavour that you are capable of producing for your State. In the great task of building up this State, you have a magnificent opportunity. You must continue to face the future, handle your jobs with the same courage, confidence and determination as you have so far displayed. Above all do not allow yourselves to be made the pawns of mischievious propagandists and self-seeking agitators who are out to exploit both you and the difficulties with which a new State is inevitably faced the Government of Pakistan and the Provincial Government have been anxiously devising ways and means whereby your housing and other difficulties, inescapable in a period of such rapid transition, may be relieved and I trust that these difficulties will soon disappear. You owe it to the great State to which you belong, to the people whom you serve and, indeed, to yourself not to be daunted by any difficulties, but to press on and go forward and maintain sustained efforts with single-minded devotion. Pakistan has a great future ahead of it. It is now for us to take the fullest advantage of what nature has so abundantly provided us with and builds up a glorious and mighty State.[96]

রেসকোর্সের বক্তৃতায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে, বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলাপালোচনায় ও বিদায়বাণীতে জিন্নাহর প্রকাশিত অভিমতে পূর্ব-বাংলার সচেতন মানুষের চোখ খুলে যায়, উর্দু ভাষা ও

[96] Broadcast Speech of Jinnah from Radio Pakistan, Dhaka on 28th March 1948.

বাংলা ভাষার প্রশ্নটি আরও সহজ হয়ে যায়; তারা স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে, উর্দু একটি আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের সূচনা মাত্র। বাঙালির কাছে রাজনৈতিক সচেতনতার স্বতন্ত্ররেখাটি সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। পূর্ব-বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নতুন মাত্রাটি যুক্ত হয় আঞ্চলিক চেতনার বিকাশ হিশেবে, ভাষা প্রশ্নটিকে সামনে রেখে রাজনীতি ও আর্থ-সামাজিক চিন্তাচেতনা, তাদের অবস্থান ও পাকিস্তান-বিদ্বেষ দ্রুতগতিতে কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়াতে থাকে। বাঙালি সচেতনভাবেই প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। বাঙালির সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে জিন্নাহর মন্তব্যে উন্মোচিত হওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা-বিদ্বেষী নীতির আসল রূপটি। তাই বাঙালি রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের প্রতি সক্রিয় সহনশীল ভূমিকা পালন করতে থাকে; এরজন্যই দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাষা-আন্দোলন পর্বে (এপ্রিল ১৯৪৮ - ফেব্রুয়ারি ১৯৫২) সাধারণ মানুষের সমর্থন লাভ করতে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। জিন্নাহ ঢাকা ত্যাগ করার পর থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন শুরু করে।

বিক্ষোভ-অনশন-ধর্মঘট

১১ই মার্চের পর, রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের মত ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত না হলেও পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে জনগণ সংগঠিতভাবে সরকারের কাছে তাদের দাবী প্রকাশ করতে শুরু করে, যেমন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চতুর্থশ্রেণী কর্মচারী'র উদ্যোগে ধর্মঘট (মার্চ ১৯৪৮); কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট (৮ই-২৫শে এপ্রিল ১৯৪৮); ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে অনুষ্ঠিত অনশন ধর্মঘট (১৮ই-২৭শে এপ্রিল ১৯৪৮); সরকারি বিক্রয়-কর ধার্যের বিরুদ্ধে পূর্ণ সাধারণ ধর্মঘট (২৬শে এপ্রিল ১৯৪৮); সংবাদপত্রের স্বাধীনতাখর্ব করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সিলেটের প্রতিবাদ-সভা (৩০শে এপ্রিল ১৯৪৮); ঢাকার পুলিশ কনস্টেবলদের বকেয়া বেতনের দাবীতে ধর্মঘট (১৩ই জুলাই ১৯৪৮); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের সমস্যা ও অব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা সভা (৩০শে জুন ১৯৪৮); ইডেন ও কমরুন্নেসা গার্লস-স্কুল ও ইডেন কলেজের ধর্মঘট (১৫ই নভেম্বর–৬ই ডিসেম্বর); ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ধর্মঘট (২৪শে নভেম্বর–৬ই ডিসেম্বর) ইত্যাদি।

১৯৪৮ থেকেই পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন স্থানে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় জোতদার-জমিদার-মহাজন ও সরকার বিরোধী বিপ্লব; যেমন, তেভাগা-আন্দোলনের দাবীতে বংশীকুণ্ডা-আন্দোলন, ভাটিপাড়া-আন্দোলন, দাসবাজার-আন্দোলন, বৈঠাখালি-আন্দোলন, সিলেট-ময়মনসিংহের হাজং-বিদ্রোহ, নাচোলের সাঁওতাল-বিদ্রোহ, সুরমা-উপত্যাকা অঞ্চলের কৃষক-বিদ্রোহ ও সিলেটের নানাকারপ্রথা[৯৭]র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। পূর্ব-বাংলা সরকার এসব আন্দোলন ও বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে আন্দোলনাঞ্চলে পুলিশক্যাম্প স্থাপন করে ব্যাপকভাবে গ্রেফতার, মিথ্যা-মামলা, সম্পত্তি-বাজেয়াপ্ত, তল্লাশি, মারপিট ও নারীধর্ষণ চালায়। পূর্ব-বাংলা সরকার কম্যুনিস্ট পার্টি ও কম্যুনিজম বিরোধী দমননীতি ও প্রচারণায়ও লিপ্ত হয়। ১৬ই মার্চ ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে, সরকারের কম্যুনিজম বিরোধী দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে রণেশ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে শুরু হয় সমগ্র পূর্ব-বাংলা জুড়ে জেলবন্দী বামপন্থীদের অনশন ধর্মঘট, যা অব্যাহত থাকে প্রায় ৪০দিন।

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ

[৯৭] টীকা– নানকার অর্থ প্রজা, আর নানকারপ্রথা হচ্ছে প্রজাপ্রথা। নানাকার-সমাজভুক্ত শ্রেণীগুলি হচ্ছে কিরাণ, ভাণ্ডারি, নমশূদ্র, মাইমল, পাটনী, মালাকার, ঢুলি, বাজনী, ধোপা, নাপিত ইত্যাদি।

৯ই জুন ১৯৪৮, ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের লক্ষ্যে স্বৈরাচারী পূর্ব-বাংলা সরকার 'বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স'-নামক একটি নতুন অর্ডিন্যান্স জারি করে স্বাধীনভাবে সংবাদপত্র পরিচালনা করার সকল সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয়। এক বছরের মধ্যেই চট্টগ্রামের 'দৈনিক পূর্ব-পাকিস্তান', ঢাকার ইংরেজি 'সাপ্তাহিক ইস্টার্ন স্টার', ভারতের 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'ইত্তেহাদ' ও 'দি নেশন' পত্রিকাগুলির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ৭ই আগস্ট ১৯৪৯, পূর্ব-বাংলা সরকার সুকৌশলে ফরিদপুরের পাংশা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'খাতক' পত্রিকার সম্পাদক খোন্দকার নাজির-উদ্দীন আহমদকে তাঁর 'আমাদের ফরিয়াদ'-শীর্ষক সম্পাদকীয়টির জন্য গ্রেফতার করে। সিলেটের মৌলভীবাজারের সাপ্তাহিক 'অভিযান' (নভেম্বর ১৯৪৯), সিলেটের সাপ্তাহিক 'আজান' (নভেম্বর ১৯৪৯), ফেনীর সাপ্তাহিক 'সংগ্রাম' (অক্টোবর ১৯৫০) বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলিকে 'জননিরাপত্তা আইন'-এর আওতায় গ্রেফতার করা হয়। ঢাকার ইংরেজি দৈনিক 'পাকিস্তান অবর্জার্ভার' ও সিলেটের সাপ্তাহিক 'আজান' পত্রিকার অফিসে ও ছাপাখানায় পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে প্রেসে তালাবদ্ধ ও অন্যায়ভাবে দলিলপত্র হস্তগত করে।[৯৮] সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সাংবাদিকরা প্রতিবাদ-সভার আয়োজন করেন, যেমন– সিলেটের জনসভা (২২শে নভেম্বর ১৯৪৯), ঢাকার সাংবাদিক-সভা (২১শে জানুয়ারি ১৯৫০), পূর্ব-বাংলার 'সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন' (১৫ই মে ১৯৫০), পূর্ব-বাংলার 'সাংবাদিক সমিতি'র কার্যকরী কমিটির সভা (১০ই মে ১৯৫০), পূর্ব-বাংলা 'সংবাদপত্র সম্মেলন' ও 'পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্মেলন'-এর সভাপতিদের বৈঠক (জুলাই ১৯৫০), পূর্ব-বাংলার 'সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন' (১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫১) ইত্যাদি।

লিয়াকত আলীর পূর্ব-বাংলা সফর

১৮ই নভেম্বর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে, বেগমসহ পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ব-বাংলায় তেরোদিনের সফরে আসেন। এ ছিল তার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম সফর। তাকে তেজগাঁ বিমানবন্দরে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের হাজার হাজার নেতা কর্মী সংবর্ধনা দেয়। ২৭শে নভেম্বর ১৯৪৯, তিনি তরুণ-সমাজের দাবীকে, চাকরির ক্ষেত্রে জনসংখ্যা অনুপাতে আসন বণ্টন করাকে, প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় বলে উল্লেখ করে বলেন, 'যদি প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় তবে পাকিস্তান ধ্বংস হবে।'[৯৯] লিয়াকত আলীর এরকম বক্তব্য প্রকাশে বাঙালির কাছে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মনোবৃত্তি ও চেহারা স্পষ্ট ধরা পড়ে, সুকৌশলে যে তারা দু'অঞ্চলের মধ্যে অসাম্যের বীজ বুনতে শুরু করেছে তাই প্রমাণ করে। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে, একইদিন, তিনি কার্জন হলের ছাত্র-সমাবেশে বলেন, 'ভাষা সম্পর্কে ছাত্রদের দাবীতে অত্যন্ত অশোভন গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।'[১০০]

সাহিত্য সম্মেলন

৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪৮ থেকে ১লা জানুয়ারি ১৯৪৯ পর্যন্ত 'পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন'-এর আয়োজন করা হয়, এর সভাপতি মণ্ডলিরা ছিলেন– স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহার (অভ্যর্থনা), ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (মূল), জসিমুদ্দীন (কাব্য), বেগম শামসুন্নাহার (শিশু-সাহিত), আবুল হাসানাৎ (ভাষা-বিজ্ঞান),

[৯৮] সাপ্তাহিক নওবেলাল, ১৭ই ও ২৪শে নভেম্বর ১৯৪৯।
[৯৯] দৈনিক জিন্দেগী, ২৮শে নভেম্বর ১৯৪৮।
[১০০] দৈনিক জিন্দেগী, ২৮শে নভেম্বর ১৯৪৮।

অধ্যক্ষ শরফুদ্দীন (ইতিহাস), ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী (পুঁথি-সাহিত্য ও লোক-সংস্কৃতি), ড. এস. আর. খাস্তাগীর (বিজ্ঞান), ডা. আব্দুল ওয়াহেদ (চিকিৎসা-বিজ্ঞান) ও অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ (শিক্ষা)।[১০১] বিপুল জনসমাবেশে প্রথম দিনের অধিবেশনে ড. শহীদুল্লাহ বলেন, 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব সত্য। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।'[১০২] ড. শহীদুল্লার ভাষণের সমালোচনা করেন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা দফতরের সচিব ফজলে আহমদ করিম ফজলী; ফলে তার ও হাবিবুল্লাহ বাহারের মধ্যে ক্রুদ্ধবাক্য বিনিময় শুরু হয় মঞ্চের ওপর। দারুণ বিক্ষোভ ও বির্তকের ঢেউ ভাঙতে শুরু করলে এক উদ্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। হাবিবুল্লাহ বাহার প্রকাশ্যেই 'ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে' সচিবের সঙ্গে 'খোলাখুলিভাবে' অশ্লীল ভাষায় মতবিনিময় করতে থাকেন।[১০৩] এমনকী ড. শহীদুল্লাহর ভাষণের সমালোচনা করেন আবুল কালাম শামসুদ্দীনও, তিনি ভাষণটির সমালোচনা করে বলেন, '[...] অখণ্ড ভারতের যুক্ত বাংলায় সাহিত্যিক অভিভাষণে এমন কথা অনেকেই বলিয়াছেন বটে; কিন্তু বিভক্ত ভারতের দ্বিখণ্ডিত বাংলায় পাকিস্তানি পরিবেশে এই শ্রেণীর কথা শুনিতে হইবে, একথা ভাবা একটু কঠিন ছিল বৈ কি! তা ছাড়া কোনো হিন্দু লেখক নয়, একেবারে স্বয়ং ডক্টর শহীদুল্লাহ 'মা প্রকৃতির' এমন স্তব গাহিবেন, একথাই-বা কে ভাবিতে পারিয়াছিল।'[১০৪] ড. শহীদুল্লাহর ভাষণ প্রসঙ্গে আকালী চৌধুরী তার 'পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে কি দেখিলাম'-শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, 'মূল সভাপতি পণ্ডিতপ্রবর শহীদুল্লাহ সাহেব তো তবু নূতন কথা কিছু আমাদের শুনিয়েছেন– মুসলমানের চেয়েও বেশি সত্য আমরা বাঙালি, প্রকৃতি মা যেন আমাদের চেহারায় ছাপ মেরে দিয়েছেন, টিকি টুপিতে আমাদের ফরখ্ করবে কি করে।– নূতন কথাই বটে, মিস্টার জিন্নাহ আর তাঁর চেলা-ফেলাদের এই এতদিনকার পুরানো দুই জাতি-তত্ত্বের রক্তক্ষয়ী চীৎকারের পর এবং পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পরও মুসলমানের চাইতে আমাদের বাঙালি পরিচয়টাই খাঁটি সত্য এর চেয়ে অভিনব কথা আর কি হতে পারে? 'পূর্ব-পাকিস্তানের' সাহিত্য সম্মেলনের প্রধান পুরোহিত্যের যোগ্য কথাই বটে। [...] কিন্তু এত বড় পণ্ডিত ব্যক্তির সমালোচনা করতে যাবো না– এ ব্যাপারে ভয়ও আছে যথেষ্ট। নিতান্ত অর্বাচীনের মত কোনো একটা দৈনিক (পত্রিকার) সভাপতি সাহেবের খুঁত ধরতে গিয়েছিলো, বলতে চেয়েছিল আমাদের সাহিত্যিক পিতামহ এই সভাপতি সাহেব দাদুর গল্পের মতই সাহিত্যের অনেক পুরানো কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন। নূতন কিছু শুনাতে পারেননি। সভাপতি সাহেব তার মুর্খের মত উত্তরই দিয়েছেন– এসব তিনি ভয় করবেন কেন! এরকম সমালোচনা কত তাঁর পায়ের তলা দিয়ে গড়ায়। শুধু তাই নয়, দৈনিকটি যে বলেছিল ডক্টর সাহেব আমাদের সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা আমদানীর কোনো প্রয়োজন অনুভব করেননি এ নাকি তার অনধিকার চর্চা। আমরাও স্বীকার করি। চোরের মুখে ধর্মের কাহিনী।'[১০৫] এসব মন্তব্যের উত্তরে, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে, ড. শহীদুল্লাহ বলেন, '১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে ঢাকায় যে সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল, তাতে বড় আশাতেই বুক বেঁধে আমি অভিভাষণ দিয়েছিলুম। কিন্তু তারপর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাতে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলুম, স্বাধীনতার নূতন নেশায় আমাদের মতিচ্ছন্ন করে দিয়েছে।'[১০৬]

ছাত্রসংঘ ও ছাত্র ফেডারেশন

[১০১] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব-বাঙালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১৯৭০।
[১০২] দৈনিক আজাদ, ১লা জানুয়ারি ১৯৪৯।
[১০৩] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব-বাঙালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১৯৭০।
[১০৪] দৈনিক আজাদ, ১লা জানুয়ারি ১৯৪৯।
[১০৫] সাপ্তাহিক সৈনিক, ৯ই জানুয়ারি ১৯৪৯।
[১০৬] উদ্বোধনী ভাষণ: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ঢাকা, ১৯৫৪।

মুহম্মদ গোলাম কিবরিয়াকে আহবায়ক করে পূর্ব-বাংলার অসাম্প্রদায়িক ও অকম্যুনিস্ট ছাত্রপ্রতিষ্ঠান হিশেবে 'পাকিস্তান ছাত্রসংঘ' আত্মপ্রকাশ করে জানুয়ারি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে, একইসঙ্গে খসড়া আকারে প্রকাশিত হয় এ-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ও গঠনতন্ত্র।[১০৭] পূর্ব-বাংলার অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও কম্যুনিস্ট-পন্থায় বিশ্বাসী 'ছাত্র ফেডারেশন' সিদ্ধান্ত নেয় যে, ৮ই জানুয়ারি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের দিনটিকে 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' হিশেবে উদযাপন করার। একই সংগঠন হাজং-চাষিদের ওপর গুলিবর্ষণ ও চাষি-হত্যার প্রতিবাদে একটি ছাত্রসভার (১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯) আয়োজন করে।[১০৮] 'ছাত্র ফেডারেশন' ও 'মুসলিম ছাত্রলীগ'-এর যৌথ উদ্যোগে মেডিক্যাল কলেজের কর্তৃপক্ষের অন্যায় ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনদিনের (১৭-১৮ই ও ২০শে এপ্রিল ১৯৪৯) পূর্ণ ছাত্রধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্রসভা ও মিছিলের পরিপ্রেক্ষিতে কলাভবনের ও ব্যারাকের গেটের সামনের রাস্তা থেকে ছাত্রকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ২৫শে এপ্রিল আরও একটি সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। তাজুদ্দীনের সভাপতিত্বে ও ছাত্রদের উদ্যোগে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয় আর্মানীটোলা ময়দানে, এতে মিটফোর্ডের ছাত্ররা বিশেষ ভূমিকা রাখে।[১০৯]

আরবি-হরফের প্রচলন

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের সহযোগিরা বাংলাকে 'মুসলমানি' করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। আরবি অক্ষরে বাংলা লেখার চক্রান্ত এবং 'গায়ের জোরে' আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার শুরু হয়, যেমন রেডিও পাকিস্তান ও পাকিস্তানপন্থী পত্রপত্রিকা 'মন্ত্রী'র বদলে 'উজির' শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করে। অন্যদিকে জিন্নাহ'র মৃত্যু ঘটায় বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ করার জন্য যে-শূন্যতা সৃষ্টি হয় সে-শূন্যতা পূরণ করার দায়িত্বগ্রহণ করেন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দীন। তাঁর সময়েই শুরু হয় বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ ঢোকানোর ষড়যন্ত্র। প্রসঙ্গত, জিন্নাহ'র মৃত্যু (১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮) এর ফলে খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল পদে আসীন হন, আর পূর্ব-বাংলায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন নূরুল আমীন। পূর্ব-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন খাজা নাজিমুদ্দীনের অনুসৃত পথ ধরেই চলতে থাকেন। তিনি ৩৫টি আসনের উপনির্বাচন বন্ধ করে দিয়ে গণতন্ত্রকে টুঁটিচেপে হত্যা করার পরিকল্পনায় লিপ্ত হন।

৯ই মার্চ ১৯৪৯, বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ ঢোকানোর উদ্দেশ্যে পূর্ব-বাংলা সরকার 'পূর্ব-বাংলা ভাষা-কমিটি' গঠন করে; এর অন্যতম সদস্য হিশেবে মনোনীত করা হয় দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক মওলানা আকরাম খাঁ ও কবি গোলাম মোস্তফাকে। বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ ঢোকানোর প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ শহীউল্লাহ বলেন, 'আরবি হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত আরবি ফারসি শব্দের আমদানি, প্রচলিত বাংলা ভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা বলে তার পরিবর্তে পদ্মাতীরের ভাষা প্রচলনের খেয়াল প্রভৃতি বাতুলতা আমাদের একদল সাহিত্যিককে পেয়ে বসল। তাঁরা এই সব মাতলামিতে এমন মেতে গেলেন, যে প্রকৃত সাহিত্য সেবা যাতে দেশের ও দশের মঙ্গল হতে পারে, তার পথে আবর্জনা স্তূপ দিয়ে সাহিত্যের উন্নতির পথ কেবল রুদ্ধ করেই খুশিতে ভূষিত হলেন না, বরং খাঁটি সাহিত্যসেবীদিগকে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত ও বিপদগ্রস্ত করতে আদাজল খেয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। তাতে কতক উচ্চপদস্থ সরকারি-কর্মচারীরা উস্কানো দিতে কসুর করলেন না।'[১১০]

[১০৭] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব-বাঙালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১৯৭০।
[১০৮] নওবেলাল, ২০শে জানুয়ারি ১৯৪৯।
[১০৯] আহমদ রফিক, একুশের ইতিহাস/ আমাদের ইতিহাস, ১৯৮৮।
[১১০] উদ্বোধনী ভাষণ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ঢাকা, ১৯৫৪।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ, তথ্য-প্রচার ও শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানও বাংলায় আরবি-হরফের প্রচলনের পক্ষে যুক্তিপ্রদান করেন, তাঁর মতে, বাংলায় আরবি-হরফ প্রচলনের দ্বারা আঞ্চলিক ভাষাগুলির সংরক্ষণের কাজ সাধিত হবে এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষাগত সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করবে।[১১১]

৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯, বাংলায় আরবি-হরফের প্রচলনের সম্পর্কে পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত সভায় অভ্যন্তরীণ, তথ্য-প্রচার ও শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান বলেন, 'সহজ এবং দ্রুত যে-হরফের মারফৎ ভাষা পড়া যায় সে-হরফই সব চাইতে ভাল। কোন হরফটা ভাল তা ঠিক করার পূর্বে একবার বিভিন্ন প্রদেশের হরফের বিচার করা প্রয়োজন। সিন্ধু ভাষা হচ্ছে সিন্ধি কিন্তু তার হরফ আরবি। পশ্চিম-পাঞ্জাবের ভাষা উর্দু হলেও তার হরফ 'নাসতালিক'। পূর্ব-বঙ্গের ভাষা ও হরফ দুই বাংলা। কিন্তু সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের ভাষা পুস্তু হলেও বহুলাংশে আরবি। বাংলায় অনেক সংযুক্তাক্ষরে স্বরবর্ণের নানা চিহ্ন থাকায় তা টাইপ রাইটিং বা সর্টহ্যান্ড হিশেবে ব্যবহার করা যায় না। নাসতালিক হরফ সম্বন্ধেও অসুবিধা। এ-অবশিষ্ট হরফসমূহের মধ্যে আরবিই সহজ এবং টাইপ রাইটিংয়েও ব্যবহার করা যেতে পারে। রোমান হরফের ন্যায় এর ষোলটি মূলরূপ আছে। সুতরাং দ্রুত লিখন ও পঠনের পক্ষে সুবিধাজনক বলে আরবিকেই পাকিস্তানের হরফ করা উচিত।'[১১২] শুধু অভ্যন্তরীণ, তথ্য-প্রচার ও শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানই আরবি-হরফ বাংলায় প্রর্বতনের পক্ষে ছিলেন এমন নয়, তাঁর সঙ্গে ছিলেন হাবিবুল্লাহ বাহর (প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী), মাহমুদ হাসান (কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা), ফজলে আহমদ করিম ফজলী (শিক্ষা-সচিব), মৌলানা জুলফিকর আলী ('হুরুফুল কুরআন'-এর উদ্ভাবক), ফজলুর রহমান (আরবি-হরফ আন্দোলন কর্মী), মৌলানা আবদুর রহমান বেখুদও (আর্মানিটোলা স্কুলের কর্মকর্তা), ওসমান গণি (টিচার্স ট্রেনিং কলেজের কর্মকর্তা)। আরবি-হরফে বাংলা লেখার পক্ষে যেসব মত প্রকাশ করা হয় সেগুলি হচ্ছে,

১. বাঙালির প্রথমে কিছুটা অসুবিধা হতে পারে এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিণামে যে সকল সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাও বিবেচনা করা প্রয়োজন;

২. দুই প্রদেশের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য দূর করার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে উভয়ের মধ্যে একই অক্ষরের প্রবর্তন; বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাই আরবি অক্ষরে লেখা হলে উর্দুভাষী বাংলা বই পড়ার সুযোগ পাবে আর বাংলাভাষী উর্দু বই পড়তে পারবে; এভাবে বাংলা ও উর্দু ভাষার সমবায়ে ও সংমিশ্রণে একটি নূতন ভাষা গড়ে উঠতে পারে; আর

৩. দেশের শিক্ষার প্রসার ও নিরক্ষরতা দূর করার জন্য আরবি-হরফের প্রবর্তন প্রয়োজন।[১১৩]

আরবি-হরফে বাংলা লেখার পক্ষে আন্দোলন চলেও ঢাকা শহরের শিক্ষালয়গুলিতে 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' (১১ই মার্চ ১৯৪৯) পালিত হয়।[১১৪] অন্যদিকে আরবি-হরফে বাংলা ও প্রাদেশিক বিভিন্ন ভাষার লেখাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সুপারিশ প্রকাশিত হয়; একইসঙ্গে ড. শহীদুল্লাহ (৪ঠা মার্চ), ড. কাজী মোতাহার হোসেন (৪ঠা মার্চ), মনোরঞ্জন ধর (২৯শে মার্চ), নঈমুদ্দীন আহমদ (৮ই এপ্রিল) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন। শিক্ষাবিদমণ্ডলির প্রতিবাদ জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা হরফ-প্রশ্ন-সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি (এপ্রিল ১৯৪৯) পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ও বর্ণমালা

[১১১] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব-বাঙালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১৯৭০।
[১১২] দৈনিক আজাদ, ১২ই মার্চ ১৯৪৯।
[১১৩] ঢাকা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯।
[১১৪] বশীর আল্‌হেলাল, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৮৫।

বিবেচনার বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে প্রেরণ করে।[১১৫] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধাচরণ করে, যেমন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংসদের কার্যকারী পরিষদের সভায় (১০ই ডিসেম্বর ১৯৪৯) আরবি-হরফে বাংলা প্রচলনের তীব্র বিরোধিতা করে, এবং তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় (১১ই ডিসেম্বর ১৯৪৯) আরবি-হরফে বাংলা লেখার প্রচেষ্টা সম্পর্কে সমালোচনা করে। ছাত্ররা, এছাড়াও, দেশের বিভিন্ন শিক্ষায়তনে বাংলায় আরবি-হরফ প্রবর্তনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।

আওয়ামী মুসলিম লীগ

সরকারি নীতি ও মুসলিম লীগ নেতাদের অগণতান্ত্রিক মনোভাবের প্রতিবাদে ২৩শে জুন ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সম্পৃক্ততায় আওয়ামী মুসলিম লীগ (বা জনতার মুসলিম লীগ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৩শে জুনের সমাবেশে মাওলানা অবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি, শামসুল হককে সম্পাদক, শেখ মুজিবুর রহমান ও খন্দকার মোশতাককে যুগ্ম-সম্পাদক ও ইয়ার মোহাম্মদ খানকে কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করে ৪০-সদস্য বিশিষ্ট এ-দলটি আত্মপ্রকাশ করে। মওলানা ভাসানী বলেন, 'দারিদ্র নিষ্পেষিত কোটি কোটি জনগণের আর্থিক উন্নয়ন ও সামাজিক সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা নিতান্ত অর্থহীন। আর্থিক সাম্য স্থাপন ব্যতীত কিছুতেই সামাজিক সাম্য স্থাপিত হইতে পারে না। পাকিস্তান রাষ্ট্রে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র ধ্বংস করিয়া ইসলামিক সমাজতন্ত্রবাদ স্থাপন করিতে হইবে। নতুবা স্বাধীনতার জন্য জনগণের আত্মবলিদান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইবে। দারিদ্র মানব জীবনে মস্ত বড় অভিশাপ আবার অর্থের প্রাচুর্য্যে অপরকে গোলাম বানাইবার ও শোষণের প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলে। অনাহারক্লিষ্ট নরনারীর নিকট স্বাধীনতার কোনো মূল্য নাই। সুতরাং আর্থিক সাম্যের ভিত্তিতে সমাজে প্রকৃত সাম্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বড় বড় কলকারখানা কৃষিজমি এবং সর্বপ্রকার যানবাহনাদি রাষ্ট্রের সম্পত্তি হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যৌথ ভিত্তিতে কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইবে। কেহই অপরের শ্রমদ্বারা লাভবান হইবার অধিকারী হইবে না। প্রত্যেককে নিজ নিজ শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হইবে। দেশে কেহই দরিদ্র বা বেকার থাকিবে না। বৃদ্ধ অক্ষমের ভরণ পোষণের ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করিবে। উচ্চতম ও নিম্নতম কর্মচারীর মধ্যে বেতনের বিরাট পার্থক্য রাখা হইবে না। কৃষক ও শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের মান অধিকতর উন্নত করা হইবে। কেহ অনাহারে, কেহ অর্ধহারে, কেহ ভোগ বিলাসে জীবন যাপন করিতে পারিবে না। সত্যিকার পাকিস্তান অর্থে আমরা বুঝি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি। সুতরাং আমাদের এখন কর্তব্য এই নবীন পূর্ব-পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সুন্দরভাবে গঠিত করা এবং মানুষের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি আনয়ন করা।'[১১৬]

২৪শে জুন ১৯৪৯ (বিকাল), আর্মানীটোলা ময়দানে প্রায় চার হাজার মানুষের সমবেশে, আওয়ামী মুসলিম লীগের সর্বপ্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয় দলের প্রধান মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে। ভাসানী তাঁর ভাষণে স্বৈরাচারের অবসানকল্পে নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের পতকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। এ-জনসভায় প্রকাশিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম ম্যানিফেস্টো, এতে ইসলামিক রাষ্ট্ররূপ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে,

[১১৫] সাপ্তাহিক সৈনিক, ২২শে এপ্রিল ১৯৪৯।
[১১৬] আবদুল হামিদ খান (ভাসানী), মুসলিম লীগ সংগঠন/ গরীব জনসাধারণের দাবী।

১. পাকিস্তান খেলাফৎ অথবা ইউনিয়ন অব পাকিস্তান রিপাবলিকস বৃটিশ কমনওয়েলথের বাইরে একটি স্বাধীন সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্র হবে;
২. পাকিস্তানের ইউনিটগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার দিতে হবে;
৩. রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আল্লার প্রতিভূ হিশেবে জনগণের উপর ন্যস্ত থাকবে;
৪. গঠনতন্ত্র হবে নীতিতে ইসলামী গণতান্ত্রিক ও আকারে রিপাবলিকান।[১১৭]

আর কৃষি-পুনর্গঠন প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে,

১. জমিদারী প্রথা ও জমির উপর অন্যান্য কায়েমী স্বার্থ বিনা খেসারতে উচ্ছেদ করতে হবে;
২. সমস্ত কর্ষিত ও কৃষি উপযোগী অকর্ষিত জমি কৃষকদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করতে হবে;
৩. তাড়াতাড়ি অর্ডিনেন্স জারী করে 'তেভাগা' দাবী মেনে নিতে হবে;
৪. রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে অবিলম্বে সমবায় ও যৌথ কৃষিপ্রথা প্রতিষ্ঠা করতে হবে;
৫. নিম্নলিখিত বিষয়ে কৃষকদের অবিলম্বে সাহায্য করতে হবে–
   (ক) সেচ ব্যবস্থার সুবিধা ও সার প্রস্তুতের পরিকল্পনা;
   (খ) উন্নত ধরনের বীজ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি;
   (গ) সহজ ঋণ দান ও কৃষি ঋণ থেকে মুক্তি;
   (ঘ) ভূমিকরের উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত ভূমিকর ৫০% কমাতে হবে;
   (ঙ) ভূমিকরের পরিবর্তে কৃষি আয়-কর বসাতে হবে;
   (চ) খাদ্যশস্য প্রভৃতি জাতীয় ফসলের সর্বনিম্ন ও সর্বউর্ধ্ব দর নির্ধারণ করতে হবে এবং পাটের সর্বনিম্ন দর বেঁধে দিতে হবে;
   (ছ) খাদ্যশস্যের ব্যবসা সরকারের হাতে একচেটিয়া থাকতে হবে;
   (জ) পাট ব্যবসা ও বুনানীর লাইসেন্স রহিত করতে হবে;
   (ঝ) সকল রকমের সমবায় সমিতিগুলিকে সাহায্য ও উৎসাহ দিতে হবে;
৬. কালে সমস্ত ভূমিকে রাষ্ট্রের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে এবং সরকারের অধিনায়কত্ব ও তত্ত্বাবধানে যৌথ ও সমবায় কৃষিপ্রথা খুলতে হবে।[১১৮]

আর দেশিয়-শিল্প প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে,

১. প্রাথমিক শিল্পগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে যেমন– যুদ্ধ, শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা, যানবাহন, বিদ্যুৎ সরবারাহ, খনি, বনজঙ্গল ইত্যাদি এবং ছোটখাটো শিল্পগুলিকে পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে সরাসরি রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে আনতে হবে;
২. পাট ও চা শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে এবং পাট ও চা ব্যবসা সরকারের হাতে একচেটিয়া থাকবে;
৩. কুটির শিল্পগুলিকে সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে বিশেষভাবে সাহায্য ও উৎসাহ দান করতে হবে;
৪. বিল, হাওর ও নদীর উপর থেকে কায়েমীস্বার্থ তুলে দিয়ে সরকারের কতৃত্বাধীনে মৎস্যজীবীদের মাঝে যৌথ উপায়ে বণ্টন করতে হবে এবং সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্যের চাষ ও মৎস্য ব্যবসার পত্তন করতে হবে। ফিশারি বিভাগের দ্রুত উন্নয়ন করে এসমস্ত বিষয়ে শিক্ষা প্রসার করতে হবে ও উন্নত ধরনের গবেষণাগার খুলতে হবে;

[১১৭] মূলনীতি, আওয়ামী মুসলিম লীগের সর্বপ্রথম জনসভা, ২৪শে জুন ১৯৪৯।
[১১৮] মূলনীতি, আওয়ামী মুসলিম লীগের সর্বপ্রথম জনসভা, ২৪শে জুন ১৯৪৯।

৫. শিল্প ও ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত একচেটিয়া অধিকার থাকবে না;
৬. বৃটিশের নিকট থেকে স্টার্লিং পাওনা অবিলম্বে আদায় করতে হবে এবং তা দ্বারা যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হবে ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়তে হবে;
৭. দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করার ভার রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে;
৮. সমস্ত বৃটিশ ও বৈদেশিক ব্যবসাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে;
৯. শিল্পে বৈদেশিক মূলধন খাটানো বন্ধ করতে হবে;
১০. শিল্পে মুনাফার হার আইন করে বাঁধতে হবে।[১১৯]

ম্যানিফেস্টো অনুযায়ী আওয়ামী মুসলিম লীগ একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিশেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়, 'ইসলামিক সমাজতন্ত্রবাদ' স্থাপন করাই এর মূল-উদ্দেশ্য, যদিও 'সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র ধ্বংস' করার কথা বলা হয়।

ভাসানীর সভাপতিত্বে, ২১শে-২৩শে অক্টোবর ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে, আওয়ামী মুসলিম লীগের তিনদিন ব্যাপী, ঢাকার রূপমহল সিনেমা-হলে, দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলে অসাম্প্রদায়িক রূপদানের উদ্দেশ্যে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি তুলে দেওয়া হয়। আবু জাফর শামসুদ্দীন বলেন, 'সাম্প্রদায়িক নাম বর্জন করে ১৯৫৫ সালে অসাম্প্রদায়িক আওয়ামী লীগ দলের প্রতিষ্ঠাকে আমি সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘোড় পরিবর্তন-সূচক ঘটনা মনে করি।'[১২০]

ভাসানী তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন, 'আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িক করার একটা প্রশ্ন দুই বৎসর পূর্বেই উঠিয়াছে এবং বিগত কাউন্সিল অধিবেশনে শাসনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার সময় আওয়ামী লীগের নাম সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার ভার আমার উপর ন্যাস্ত করা হইয়াছিল এবং জনমত গ্রহণ করিয়া অধিবেশন আহ্বান নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। আমি ভিন্ন ভিন্ন জেলা, মহকুমা আওয়ামী লীগ কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, দেশের অধিকাংশ লোকই, বিশেষত কর্মীদের বহুলাংশ প্রতিষ্ঠানকে অসাম্প্রদায়িক করার শুধু পক্ষপাতীই নয়, জোর দাবীও জানাইয়াছেন।'[১২১] রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে ভাসানী বলেন, 'আমি আরও দাবী জানাইতেছি যে, ব্যবস্থা-পরিষদের আসন্ন বৈঠকে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রস্তাব পাশ করা হউক। পূর্ব-বঙ্গ প্রাদেশিক সরকারের সমস্ত অফিস আদালতে বাংলা ভাষার প্রবর্তন করিতে হইবে এবং স্কুল কলেজের অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষায় মুদ্রিত করিতে হইবে।'[১২২] আর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা প্রস্তুত এই তিন-বিষয়ের ক্ষমতা ছাড়া আর সমস্ত বিষয় আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। দেশরক্ষা বিভাগের নৌ-বাহিনীর সদর দফতর পূর্ব-বঙ্গে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যও প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতাধীন থাকিবে। এই মর্মে একটি প্রস্তাব আসন্ন ব্যবস্থা-পরিষদের বৈঠকে যেন পাশ করা হয় এই জন্য ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের নিকট আমি অনুরোধ জানাইতেছি।'[১২৩]

পূর্ব-বাংলা শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার কমিটি

[১১৯] শামসুল হক, মূলদাবী, আওয়ামী মুসলিম লীগের সর্বপ্রথম জনসভা, ২৩-২৪শে জুন ১৯৪৯।
[১২০] আবু জাফর শামসুদ্দীন, কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেল ১৯৫৭, দৈনিক সংবাদ, ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮২।
[১২১] মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সভাপতির ভাষণ, আওয়ামী মুসলিম লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন, ২১শে-২৩শে অক্টোবর ১৯৫৫।
[১২২] মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সভাপতির ভাষণ, আওয়ামী মুসলিম লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন, ২১শে-২৩শে অক্টোবর ১৯৫৫।
[১২৩] মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সভাপতির ভাষণ, আওয়ামী মুসলিম লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন, ২১শে-২৩শে অক্টোবর ১৯৫৫।

১৪-১৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৯, পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের অধিবেশনগুলি অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের শেষদিন (১৬ই ডিসেম্বর) অভ্যন্তরীণ, তথ্য-প্রচার ও শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের উপায় সন্ধানের জন্য একটি শক্তিশালী কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করেন; একইসঙ্গে তিনি প্রস্তাব করেন যে, এ-কমিটির দায়িত্ব হবে– উর্দু অভিধান ও বিশ্বকোষ প্রণয়ন করা এবং বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় টেকনিক্যাল শব্দাবলীর উর্দু প্রতিশব্দ আবিষ্কার করা।[১২৪] ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫০, অভ্যন্তরীণ, তথ্য-প্রচার ও শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের উদ্যোগে 'কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড'-কর্তৃক ১৯জন সদস্য নিয়ে ও ড. আবদুল হকে সভাপতি করে একটি কমিটি তৈরি করা হয়।[১২৫] ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫০, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে আরবি-হরফে বাংলা লেখার প্রাথমিক শিক্ষাদানের লক্ষ্যে পূর্ব-বাংলার কয়েকটি জেলায় কেন্দ্রীয় শিক্ষাদফতরের উদ্যোগে ২০টি সরকারি ও ৩৭টি বেসরকারি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়।[১২৬] এমনকী অভ্যন্তরীণ, তথ্য-প্রচার ও শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান কেন্দ্রীয় খরচে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য আরবি-হরফে বাংলা বই ছাপিয়ে বিনামূল্যে সেগুলি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা করেন।[১২৭] প্রাদেশিক সরকারের উদ্যোগে ২৩জন সদস্য নিয়ে 'পূর্ব-বাংলা শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার কমিটি'-নামক একটি শক্তিসম্পন্ন কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির মূল-উদ্দেশ্য– প্রদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, নারী এবং সংখ্যালঘুদের শিক্ষাব্যবস্থা (ইসলামিক আদর্শের ভিত্তিতে) পুনর্গঠনের কাজে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া। কমিটির সভাপতি হিশেবে মৌলানা আকরম খাঁ নিযুক্ত হন।[১২৮] 'পূর্ব-বাংলা শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার কমিটি' প্রাদেশিক সরকারের কাছে প্রাথমিক-শিক্ষা সম্পর্কে কিছু সুপারিশ-প্রস্তাব উত্থাপন করে, এবং পরে (জুন ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ) শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কীয় বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করে কিছু চূড়ান্ত সুপারিশ-প্রস্তাব প্রাদেশিক সরকারের কাছে দাখিল করে। এতে বলা হয়,

১. প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত হবে না; প্রাথমিক পর্যায়ে শুধুমাত্র মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়ার নীতি সর্বজনস্বীকৃত;

২. আরবি বর্ণমালা শিক্ষাদান এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে কোরাণ ও দীনিয়াত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা তৃতীয় শ্রেণী থেকে কর্যকারি করা উচিত।[১২৯]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

খাজা নাজিমুদ্দীন কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউড হলের এক সভায় (১৯৪৬ খিস্ট্রাব্দের আগস্ট মাসে) বলেছিলেন, 'আমাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে।' তাঁর এই দায়িত্বহীন মন্তব্যে সাড়া বাংলা জুড়ে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলি সংঘটিত হয়েছিল। ঠিক তেমনি খাজা নাজিমুদ্দীন গভর্নর জেনারেল থাকাকালীন সময়ে ঢাকার 'চিফসেক্রেটারি সম্মেলন'-এ (৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫০) পূর্ব-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এক উত্তেজনাপূর্ণ সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা প্রদান করেন, ফলে শুরু হয় পাকিস্তানোত্তর পূর্ব-বাংলায় সর্ববহৎ ও সর্বাপেক্ষায় ভয়ঙ্কর ও নাশকতামূলক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১০ই ফেব্রুয়ারি ঢাকার নবাবপুর, সদরঘাট, পাটুয়াটুলী, ডিগবাজার, ইংশিল রোড, বংশাল, চক প্রভৃতি অঞ্চলে শুরু হয় গণ্ডগোল, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং হত্যা। এছাড়া ১৩ই ফেব্রুয়ারি বরিশালের ঝালুকাঠি ও নলছিটি থানায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়; কুমিল্লার ভৈরব-জাংশনের একটি ট্রেন সাম্প্রদায়িক

[১২৪] দৈনিক আজাদ, ১২ই ডিসেম্বর ১৯৪৯।
[১২৫] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব-বাঙালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১৯৭০।
[১২৬] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব-বাঙালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১৯৭০।
[১২৭] দৈনিক আজাদ, ২৪শে মে ১৯৫০।
[১২৮] দৈনিক আজাদ, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫০।
[১২৯] মৌলানা মুহম্মদ আকরম খাঁ'র বিবৃতি (২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৫১), দৈনিক আজাদ, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৫১।

দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা আক্রান্তও হয়। ১৩-১৬ই ফেব্রুয়ারি নোয়াখালীর ফেনীতে, ১৪ই ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে, ১৬ই ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলার কয়েকটি অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে ২০শে ফেব্রুয়ারি সাত-লক্ষ হিন্দু-বাঙালি স্বভূমি ত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ও শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫০, ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি সভার আয়োজন করে। ১২ই ফেব্রুয়ারি, ঢাকার শিক্ষক ও ছাত্রদের যৌথসভায় ড. শহীদুল্লাহকে সভাপতি করে 'পূর্ববঙ্গ শান্তি ও পুনর্বসতি কমিটি'-নামক একটি কমিটি গঠিত হয়। 'পূর্ববঙ্গ শান্তি ও পুনর্বসতি কমিটি' হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জনগণের প্রতি আহ্বান জানাতে 'পূর্ব-পাকিস্তানের নাগরিকদের নিকট আবেদন'-শীর্ষক একটি ইশতেহার প্রচার করে। মুসলমানদের প্রতি বিশেষ আবেদন জানিয়ে বলা হয় যে, পাকিস্তানের প্রত্যেক মুসলমানের মনে রাখা উচিত হিন্দুস্থানের কোনো অংশে হিন্দুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কোনো অন্যায়ের জন্য এদেশের হিন্দুদের কিছুতেই দায়ী করা যায় না। মুসলমানদের ন্যায় তারাও স্বাধীন পাকিস্তানের নাগরিক এবং পাকিস্তান সরকার যখন তাদের নাগরিক বলে স্বীকার করেছে তখন জানমালের নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদের ন্যায় তাদেরও রাষ্ট্রের ওপর সম্পূর্ণ দাবী আছে। একথা প্রত্যেক মুসলমানের স্মরণ রাখা উচিত যে, পাকিস্তানের হিন্দুরা হিন্দুস্থানের মুসলমানের বিনিময় জামানত হিশেবে বাস করছে না। তারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকারের বলেই বাস করছে। অতএব একজন মুসলমানের কোনো অবস্থাতেই একজন হিন্দুর, যে মুসলমানের মত একজন পাকিস্তানের স্বাধীন নাগরিক, ওপর অন্যায় উৎপীড়ন করার অধিকার নেই। প্রত্যেক শিক্ষিত ও বিবেচক মুসলমানের স্মরণ রাখা উচিত যে, পশ্চিম-বঙ্গের দাঙ্গার প্রতিবাদ এখানে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার করলে তাতে হিন্দুস্থানের মুসলমানদের কোনো উপকার হবে না।

একই ইশতেহারে হিন্দু-সম্প্রদায়ের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলা হয় যে, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' জন্মভূমিকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পরিত্যাগ করবেন না। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শানুসরণে হিন্দু-মুসলমানের মিলনমন্ত্র গ্রহণ করে ক্ষামা দ্বারা ক্রোধকে জয় করা উচিত।[১৩০]

ফেব্রুয়ারি ১৯৫০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্রদের সমন্বয়ে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শান্তি কমিটি'-নামক আরও একটি কমিটি গঠিত হয়। ২রা মার্চ ১৯৫০, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শান্তি কমিটি' একটি সভার আয়োজন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, একইসঙ্গে 'শান্তি দিবস পালন করুন'-শীর্ষক একটি ইশতেরাহ প্রকাশ করে। মনে রাখা আবশ্যক যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের আন্দোলনগুলি ছাত্র-আন্দোলন হিশেবেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাদের আন্দোলনগুলি হয়ে ওঠে রাষ্ট্রভাষা দাবীর পক্ষে, দমননীতির বিরুদ্ধে, বেতনভুক্ত কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে, বাংলায় আরবি-হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে। ছাত্রসমাজের প্রগতিশীল আন্দোলনগুলির মধ্যেই বাঙালির স্বাধীন চিন্তাধারা ও বলিষ্ঠ সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় ফুটে ওঠে, একইসঙ্গে কায়েমী-স্বার্থবাদীদের চক্রান্তকে বানচাল করে দিতে সমর্থ করে। ছাত্র দ্বারা পরিচালিত প্রগতিশীল আন্দোলনগুলি পূর্ব-বাংলাব্যাপী গণ-আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। গণ-আন্দোলনের জন্যই পুলিশ রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের খাপরা ওয়ার্ডে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কম্যুনিস্ট বন্দীদের ওপর গুলি চালায়, এ-মর্মান্তিক ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে নিহত হন বিজন সেন, হানিফ শেখ, আনোয়ার হোসেন, কম্পরাম শিং, সুধীন ধর, দেলোয়ার হোসেন ও সুখেন ভট্টাচার্য।

মূলনীতি নির্ধারণ কমিটি

[১৩০] পূর্ব-পাকিস্তানের নাগরিকদের নিকট আবেদন, পূর্ববঙ্গ শান্তি ও পুনর্বসতি কমিটি, ১৯৫০।

পাকিস্তান গণপরিষদের উদ্যোগে সাংবিধানিক 'মূলনীতি নির্ধারণ কমিটি' গঠন করা হয় ১২ই মার্চ ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে। ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৫০, পাকিস্তান গণপরিষদ সাংবিধানিক 'মূলনীতি নির্ধারণ কমিটি' একটি প্রতিবেদন গণপরিষদে পেশ করে।[১৩১] 'মূলনীতি নির্ধারণ কমিটি' যেসব সুপারিশ প্রকাশ করে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে,

১. কেন্দ্রীয় আইন সভায় দুইটি পরিষদ থাকবে।

প্রথম– ইউনিটসমূহের প্রতিনিধি– ইউনিটসমূহের আইনসভার প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হবে।

দ্বিতীয়– জনসাধারণের প্রতিনিধি পরিষদ– জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হবে।

তৃতীয়– প্রদেশসমূহের প্রতিনিধিত্ব– বেলুচিস্তানসহ বর্তমানের সকল প্রদেশের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি দ্বারা ইউনিটসমূহের প্রতিনিধি পরিষদ গঠিত হবে।

দুই পরিষদের পারস্পরিক ক্ষমতা ও কেন্দ্রীয় শাসনভারের উভয় পরিষদ সমান ক্ষমতার অধিকার হবে। কোনো বিষয়ে মতবিরোধ উপস্থিত হলে সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহূত হবে। বাজেট ও অর্থসংক্রান্ত বিল উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে আলোচিত হবে।

যুক্ত অধিবেশনের ক্ষমতা রাষ্ট্রনায়কের উপর ন্যস্ত হবে।

২. রাষ্ট্রনায়ক কর্তৃক প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হবেন।

জরুরি অবস্থায় কেন্দ্রে রাষ্ট্রনায়কের যে ক্ষমতা থাকবে প্রদেশে প্রাদেশিক শাসনকর্তারও সে-ক্ষমতা থাকবে, তবে এ-সকল ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপকতায় তিনি রাষ্ট্রনায়কের নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশাধীন থাকবেন।

প্রদেশের মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্তের ব্যাপারের প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে রাষ্ট্রনায়কের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রাধীনে কাজ করতে হবে।

৩. প্রাদেশিক ও সম্মিলিত বিষয়ের তালিকা সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয়-সাধনের ক্ষমতা কেন্দ্রের থাকবে। এ-সম্পর্কে কেন্দ্রীয় আইনসভা আইন প্রণয়ন করতে পারে।

কেন্দ্রীয় আইনসভা কোনো আইন প্রণয়ন করলে পরিচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে আইন প্রণয়ন করে কেন্দ্রীয় আইনসভা এর সংশোধিত অথবা বাতিল করতে পারবে, কিন্তু যে প্রদেশের উপর এ আইন প্রয়োগ হবে সে-প্রদেশের আইনসভায় আইন পাশ করে তা সংশোধিত বা বাতিল করা চলবে না।

কেন্দ্রীয় আইনসভা ও প্রদেশিক আইনসভায় প্রণীত আইনের অসাঙ্গস্য বা কোনো বৈশাদৃশ্য দেখালে কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রাদেশিক আইনসভার উপর প্রাধান্য লাভ করবে।

জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে কেন্দ্র প্রাদেশিক তালিকায় উল্লিখিত যেকোনও বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারবে।

প্রদেশের শাসনক্ষমতা এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন এবং প্রদেশের প্রচলিত আইনের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকার

[১৩১] বশীর আল্‌হেলাল, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৮৫।

এ-সম্বন্ধে কোনো নির্দ্দেশ দেওয়া প্রয়োজন মনে করলে ফেডারেশনের শাসনক্ষমতা অনুসারে সে-নির্দ্দেশ দান করবেন।

প্রত্যেক প্রদেশের শাসনক্ষমতা এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে ফেডারেশনের শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় তা বাধাস্বরূপ না হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এছাড়াও 'মূলনীতি নির্ধারণ কমিটি' সুপারিশ করে যে, জরুরি ব্যবস্থা হিশেবে রাষ্ট্রনায়ককে সামরিকভাবে শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখার ক্ষমতা দেওয়া, উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করা, গঠনতন্ত্র সংশোধন কার্য অত্যন্ত কঠিন করা, তালিকাভুক্ত ক্ষমতা ব্যতীত সমস্ত অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে অর্পণ করা, ইত্যাদি।

নাজিমুদ্দীনের ইচ্ছা অনুযায়ী 'মূলনীতি নির্ধারণ কমিটি' যেসব সুপারিশ প্রকাশ করে এতে প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দ ব্যতীত মুসলীম লীগ সভ্যদের মধ্যে, বিশেষ করে মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে, এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তারা জনগণের মতামতকে অস্বীকার করতে না পেরে 'ধরি মাছ না ছুঁই জল' নীতিটি অবলম্বন করে এক প্রস্তাবাবলী প্রকাশ করেন, এতে বলা হয় যে,

১. ভৌগলিক ব্যবধান পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে অত্যন্ত বেশি এবং দুটি অঞ্চলের মধ্যে যোগসূত্র নাই সে-কারণে পূর্ব-বঙ্গকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে এবং শাসনতন্ত্রে পূর্ব-বঙ্গের জন্য একটি ভিন্ন তালিকা প্রণয়ন করতে হবে;

২. পূর্ব-বঙ্গের যানবাহন যেহেতু পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্য সকল প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগহীন সেহেতু এ পরিচালনার ভার থাকবে পূর্ব-বঙ্গের উপর, আর আমদানী-রপ্তানী ব্যবসায়ও যতটা সম্ভব পূর্ব-বঙ্গ সরকার দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত;

৩. গঠনতন্ত্র সংশোধন করার ব্যবস্থা কঠিন করা উচিত নয়;

৪. শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগদ্বয় পূর্ব-বঙ্গ সরকারের ক্ষমতাধীন রাখা প্রয়োজন।

এছাড়া 'মূলনীতি নির্ধারণ কমিটি'র অন্যসব সুপারিশের ক্ষেত্রে সভ্যরা নীরব ভূমিকা পালন করেন।

'মূলনীতি নির্ধারক কমিটি'র সুপারিশ সম্বন্ধে 'দৈনিক আজাদ' যে-মন্তব্য প্রকাশ করে তা হচ্ছে যে, এই শাসন-ব্যবস্থায়, বস্তুত পাকিস্তানের রাষ্ট্রকর্তা ও প্রধানমন্ত্রী মিলে নিরুদ্বেগে যথেচ্ছাচারী শাসন কায়েম করতে পারেন। পাকিস্তান যে-আজাদীর স্বপ্ন দেখেছিল এবং গণতন্ত্রের যে-আদর্শ গ্রহণ করেছিল তার কোনো ছাপ প্রস্তাবিত শাসনব্যবস্থায় নেই। উক্ত ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের উপর একটি ফ্যাসিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত করার আয়োজন চলছে।[১৩২] গণপরিষদের কাছে প্রস্তাবিত একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশটি জনগণের কাছে প্রকাশিত হওয়ার পর বাঙালি সচেতন শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়; বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রকাশের অংশ হিশেবে সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে ৪-৫ই নভেম্বর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে একটি সমাবেশ এবং ১২ই নভেম্বর পূর্ব-বাংলা জুড়ে গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিনের সময়ই (১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে) প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের ভাবী সংবিধানের রূপরেখা হিশেবে 'মূলনীতি নির্ধারণ কমিটি'র প্রস্তাব প্রণয়ন করেন, যা ছিল বাংলা-স্বার্থের পরিপন্থী। 'মূলনীতি নির্ধারণ কমিটি'র প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয় পাকিস্তানের সংবিধানের অবজেক্টিবগুলি ('মেঘনা প্রস্তাব')। 'মেঘনা প্রস্তাব'-এ বলা হয়,

[১৩২] দৈনিক আজাদ, ৬ই অক্টোবর ১৯৫০।

1. Sovereignty belongs to Allah alone but He has delegated it to the State of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by Him as a sacred trust.
2. The State shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people.
3. The principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed.
4. Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah.
5. Adequate provision shall be made for the minorities to freely profess and practice their religions and develop their cultures.
6. Pakistan shall be a federation.
7. Fundamental rights shall be guaranteed.
8. Judiciary shall be independent.

রাষ্ট্রভাষা আরবি

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে, নাজিমুদ্দীনের সময়েই, আগা খান আরবিকে রাষ্ট্রভাষা হিশেবে গ্রহণের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। তার মন্তব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পত্রপত্রিকায় বির্তক সৃষ্টি হয়। তার মন্ত্যব্যের বিপক্ষে 'পাকিস্তান অবজাভার' ও 'মর্নিং নিউজ' এবং পক্ষে 'দৈনিক আজাদ' মন্তব্য প্রকাশ করে।

'পাকিস্তান অবজাভার' বলে,

> We are glad that Aga Khan has done some plain speaking, at the risk of being misunderstood, regarding the language controversy. Though we do not think that making Arabic the state Language of Pakistan is a feasible proposition still has done a service by boldly attacking some false notions about Urdu. The powers that be in Karachi will do well to ponder over the words. The only wise course under the circumstances is to adopt both Bengali and Urdu as the state Language of Pakistan.[133]

'মনিং নিউজ' বলে,

> All three reasons that the Aga Khan has advanced for Arabic and against Urdu appear to be on the face of them fallacious. In fact, these arguments, each one of them, can well be used, with equal force against Arabic being the state language of Pakistan! We mean no disrespect to the Aga Khan when we respectfully differ from him. Arabic has not been able to unite the Arabs themselves, how can it unite Pakistan with the Arab world? Unity in the world of Islam will work out of other solid factors than language.[134]

'আজাদ' বলে,

> His Highness the Aga Khan has made a significat proposal. He has suggested that Arabic be made the State Language of Pakistan. His proposal is not new. It has got many supporters both in Eastern and Western Pakistan. At a meeting of the Eastern Pakistan Muslim League Council a resolution in favour of Arabic has already been passed. It therefore appears that the movement in support of Arabic is gaining ground. The leaders of the country and the thoughtful section of the people should therefore go deeply into this matter.[135]

[133] Pakistan Observer, 13 February 1951.
[134] Morning News, 14 February 1951.
[135] Azad, 13 February 1951.

এমনকী পূর্ব-বাংলার মুসলিম লীগের অধিবেশনেও আরবিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতীয় পত্রিকা 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' ও 'যুগান্তর' আগা খানের এ-প্রস্তাবকে অবাস্তব বলে উল্লেখ করে। 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' বলে,

> Bengali Muslims who have been resisting even the adoption of Urdu, are likely not even to consider the suggestion seriously in spite of its emergence from so exalted a religious leader. It is strange indeed that such impractical suggestions are sometimes made by people who are expected to know better. Possibly they so with an eye of the gallary alone.[136]

'যুগান্তর' বলে,

> More than half of the population of Pakistan speaks Bengalu. Learning of Arabic will be difficult for them, and learning of both Arabic and Urdu will be all the more difficult for the minorities. Let us see what is in store for them.[137]

বাঙালি বুদ্ধিজীবীগণও বিদেশী ভাষা আরবিকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন, তাদের মতে, বিদেশী ভাষা শিক্ষা করে তার মারফৎ জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা করা সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়সাধ্য। এমনকী ১৬ই মার্চ ১৯৫১, কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত পূর্ব-বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ অধ্যাপক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'বাংলা ভাষা অবহেলিত হলে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিদ্রোহ করব।'

যুবসম্মেলন

জেনারেল গভর্নর নাজিমুদ্দীনের সময়ে, ঢাকায় জাড়িকৃত ১৪৪-ধারা ও ব্যাপক ধরপাকড়ের মধ্যে বুড়িগঙ্গার বুকে 'ভাসমান গ্রীনবোটে' যুবসম্মেলন (২৭শে ও ২৮শে মার্চ ১৯৫১) অনুষ্ঠিত হয়। এখানেই সিলেটের মাহমুদ আলীকে সভাপতি, অলি আহাদকে সাধারণ সম্পাদক এবং ইমাদুল্লাহ ও মোহাম্মদ সুলতানকে যুগ্ন-সম্পাদক করে পূর্ব-বাংলা যুবলীগ গঠিত হয়। একইসঙ্গে একটি প্রচারপত্রও প্রকাশিত হয়, এতে বলা হয় যে, দলমত নির্বিশেষে পাকিস্তানের যুবশক্তি যাতে একটি সংগঠনে সমবেত হয়ে নিজেদের ও দেশের উন্নতির জন্য একটি প্রগতিশীল যুব-আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারে তার জন্য ঢাকায় একটি পাকিস্তান যুব-সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এ সম্মেলন ও সংগঠন দলমত ও ধর্ম নিরপেক্ষ। যে-কোনো ধর্মের যুবক-যুবতী এতে যোগদান করতে পারে।[১৩৮] যুবসম্মেলনের পর ছাত্র দ্বারা পরিচালিত ও বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীক 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর উদ্যোগে ঢাকায় 'রাষ্ট্রভাষা পতাকা দিবস' (৫ই এপ্রিল ১৯৫১) পালিত হয়। ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম 'রাষ্ট্রভাষা হিশেবে প্রতিষ্ঠিত' করার উদ্দেশ্যে ছাত্ররা আরও একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করে।[১৩৯]

---

[136] Hindustan Standard, 14 february 1951.
[137] Jugantar, 13 February 1951.
[১৩৮] পাকিস্তান যুব সম্মেলনের ঘোষণা; ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ, প্রথম খণ্ড, ১৯৮৪।
[১৩৯] বশীর আল্‌হেলাল, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৮৫।

ফাল্গুন– খুনে-রাঙা জয়-নিশান

১৯৫২-এর ভাষা-আন্দোলন

১৬ই অক্টোবর ১৯৫১, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হওয়ায় উর্দুভাষী খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন। তাঁর সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি সমস্যা সমাধানের চেয়ে সমস্যা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ওস্তাদ। ২৫শে জানুয়ারি ১৯৫২, খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর-পরই সবেগমে পূর্ব-বাংলায় দশ-দিনের সফরে এসে ঢাকার নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে (২৬শে জানুয়ারি ১৯৫২) এবং পল্টন-ময়দানে হাজার জনতার সমাবেশে (২৭শে জানুয়ারি ১৯৫২) ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু এবং আরবি-হরফে বাংলা লেখার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে। এ ঘোষণার মধ্য দিয়েই পূর্ব-বাংলা ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত আরও বেশি জোরদার হয়।

পাকিস্তানে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির বাস, এবং এখানে অর্ধেকের চেয়েও বেশি মানুষের ভাষা বাংলা; কিন্তু বাংলাকে শোষণের জন্য 'ইসলামি তমদ্দুন'-এর নামে রাষ্ট্রভাষা হিশেবে উর্দুকে বাঙালির কাঁধে চাপিয়ে দিতে পারলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী জানে, বাঙালির জাতিসত্ত্বা (ভাষা, ভূখণ্ড, অর্থনীতিক জীবন ও মানসিক গঠনভঙ্গী) হনন করে সহজেই তাদের আরও কিছুদিনের জন্য শাসন করতে সক্ষম হবে, এবং তাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে শোষণের ব্যবস্থাটি আরও শ্রমসাধ্য-দুঃসাধ্য-দুর্মর করতে পারবে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ইচ্ছা করেই বুঝতে চায়নি যে, তাদের পাকিস্তানের প্রত্যেক ভাষাকে সমমর্যাদা দান করা উচিত, এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণকে নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও রাষ্ট্রকর্ম সম্পাদন করার অধিকার দেওয়া বাঞ্ছনীয়; বরং তাদের কর্মকাণ্ডে এই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিভিন্ন ভাষাভাষী– বাঙালি, পাঞ্জাবি, পাঠান, সিন্ধি, বেলুচি প্রভৃতি– জাতির ভিতর সংহতির পরিবর্তে ইচ্ছা করেই সৃষ্টি করা হয়েছে জাতিগত ও প্রদেশগত রেষারেষি ও বিভেদ। মুসলিম লীগ সরকার, উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে চালু করার ষড়যন্ত্রে বিভিন্ন জাতির অধিকার ও কৃষ্টির উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখে, এবং এরই কারণে পাকিস্তানের সার্বিক উন্নতি ব্যাহত হতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির ভাষা (বাংলা, পুস্ত, পাঞ্জাবি, সিন্ধি) এর অধিকার ও তাদের কৃষ্টির উন্নতির উপর পাকিস্তানের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও সামগ্রিক উন্নতি-সংহতি নির্ভরশীল– এসব কথা ইচ্ছা করেই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বুঝতে চায়নি, তাদের বোঝানো সম্ভব নয়, কারণ যারা না বোঝার ভাণ করে নিশ্চুপ থাকে, তাদের বোঝানো কী সম্ভবপর।

উর্দুভাষী খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁর পল্টনের বক্তৃতায় রাষ্ট্রভাষা-প্রশ্নে তাঁর প্রয়াত মুবিন জিন্নাহ'র বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার মন্তব্য প্রকাশ করতেই পূর্ব-বাংলায় শুরু হয় নূতন পর্যায়ের রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন, অর্থাৎ ১৯৫২-এর ভাষা-আন্দোলন। হরতাল, ধর্মঘট, প্রতিবাদ ও ছাত্রবিক্ষোভে ভরা ১৯৫২-এর ভাষা-আন্দোলন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা আবশ্যক।

২৯শে জানুয়ারি ১৯৫২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি প্রতিবাদ সভা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের অনুষ্ঠিত হয়। ৩০শে জানুয়ারি ১৯৫২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের 'প্রতীক'-ধর্মঘট চলাকালে খালেক নওয়াজ খানের সভাপতিত্বে, পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী, কলাভবনের আমতলায় ছাত্ররা নাজিমুদ্দীনের পল্টনের বক্তৃতার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে, যার উদ্দেশ্য রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে জোরাল দাবী ব্যক্ত করা ও নাজিমুদ্দীনের

বক্তৃতার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করা; একইসঙ্গে নাজিমুদ্দীন পূর্ব-বাংলার মূখ্যমন্ত্রী থাকাবস্থায় তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাশেষে একটি ছাত্র-মিছিল ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করার উদ্যোগ নিলে পূর্ব-বাংলা 'মুসলিম ছাত্রলীগ'-এর নেতাকর্মীরা এর বিরোধিতা করে। তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ছাত্র-মিছিলটি অগ্রসর হতে থাকে, এবং ছাত্রদের কণ্ঠে আওয়াজ ওঠে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'আরবি অক্ষর আমরা সহ্য করব না', 'নাজিমুদ্দীন গদী ছাড়ো' ইত্যাদি। ছাত্র-মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে ফুলার রোড ও বর্ধমান হাউস (পূর্ব-বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন) হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রা শেষে ছাত্ররা বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি শহরব্যাপী স্কুল-কলেজে ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[১৪০]

৩১শে জানুয়ারি ১৯৫২, ছাত্র-যুবকগোষ্ঠীর উদ্যোগে 'ভাষা-আন্দোলন'কে সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে পুরনো ঢাকার বার-লাইব্রেরিতে মৌলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ-সভায় ঢাকার রাজনীতি-সচেতন ছাত্র-যুবক-বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন; এতে নাজিমুদ্দীনের বক্তব্যের তীব্র নিন্দা, বাংলাকে অবিলম্বে 'পাকিস্তান'-এর অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিশেবে গ্রহণ করা ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট পলানের সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ-সমর্থন জানানো হয়। নূরুল আমীন সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে বাংলাপ্রদেশ জুড়ে ১১ই ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলনের 'প্রস্তুতি দিবস' ও ২১শে ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; একইসঙ্গে ৪০ সদস্যভুক্ত 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কর্মপরিষদ' গঠিত হয়।[১৪১] ৩১শে জানুয়ারির সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীতে বলা হয় যে,

১. বিভিন্ন রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এ-সভা ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব-বাংলার ছাত্র ও জনগণের সঙ্গে নিজের চুক্তি লঙ্ঘন করে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলে সম্প্রতি ঢাকায় যে বক্তৃতা প্রদান করেছেন তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও নিন্দা ব্যক্ত করছে। সে হিশেবে এ-সভা খাজা নাজিমুদ্দীনকে তার অগণতান্ত্রিক ও অযাচিত ঘোষণা প্রত্যাহার করার দাবী জানাচ্ছে;

২. বাংলা ভাষাকে হত্যার আর একটি চক্রান্ত হিশেবে বাংলায় আরবি-অক্ষর প্রচলনের জন্য এ-সভা সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করছে;

৩. ঢাকা শহরে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট করার যে সিদ্ধান্ত ঢাকার ছাত্ররা গ্রহণ করেছে এ-সভা তার প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে;

৪. এ-সভা প্রস্তাব করছে যে, বাংলা হবে পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু জনসাধারণের রাষ্ট্রভাষা; আর পশ্চিম-পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণ যদি উর্দুকে তাদের সাধারণ ভাষা বলে স্বীকার করেন তা হলে উর্দুই তাদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে;

৫. এ-সভা অবিলম্বে শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল আটক বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার ও জননিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার করার দাবী জানাচ্ছে।

২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টির পূর্ব-বাংলা সংগঠনী কমিটি একটি ইশতেহার প্রকাশ করে, এতে বলা হয় যে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা উচিত এবং সকল ভাষার সমমর্যাদা দান করা আবশ্যক। একইসঙ্গে বাঙালি-অবাঙালি সকল জনসাধারণকে এসব দাবী আদায়ের জন্য সমবেত হওয়ার আহ্বান জানায়।[১৪২] বাংলাসহ অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার সমমর্যাদা দান ও রাষ্ট্রীয় অধিকার আদায় করার জন্য একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে বাঙালি-অবাঙালির গণতান্ত্রিক আন্দোলনের

[১৪০] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব-বাঙালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১৯৭০।
[১৪১] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব-বাঙালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১৯৭০।
[১৪২] 'বাংলা ভাষার অধিকার ও সকল ভাষার সমান মর্য্যাদা কায়েম করুন', পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটির সার্কুলার, ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

মিলিত-প্রচেষ্টা যে সাফল্যমণ্ডিত হতে বাধ্য– এ-বিষয়ে এ ইশতেহারেও গুরুত্বারোপ করা হয়।[১৪৩] পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির পূর্ব-বাংলা সংগঠনী কমিটি, ভাষা-আন্দোলনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, ঢাকা শহরে ৪ঠা ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট পালনের প্রস্তাবটির সমর্থন জানায়।

৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন ঢাকা ত্যাগ করার পূর্বে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন,

> [...] আপনাদের প্রদেশের ভাষা কি হবে তা এ প্রদেশের অধিবাসীরাই চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করবে, তবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হতেই চলেছে, অন্য কোনো ভাষা নয়, তা যথাসময়ে হবে। [...] এ ব্যাপারে যে আপনাকে বিভ্রান্ত করবে, সেই পাকিস্তানের দুশমন।[১৪৪]

খাজা নাজিমুদ্দীন এরকম সর্তকবাণী প্রকাশ করা সত্ত্বেও ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, পূর্ব-বাংলার সমগ্র শিক্ষায়তনে পূর্ণ-হরতাল সাফল্যমণ্ডিতভাবে পালিত হয়। দশ-হাজার ছাত্রছাত্রীর সমাবেশে ও গাজীউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক সভায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি'কে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি'র একটি অঙ্গসংগঠন হিশেবে ঘোষণা করা হয়।[১৪৫] সভাশেষে একটি শোভাযাত্রা ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে, এসময় ছাত্র-জনতার কণ্ঠে প্রকাশিত হয়– 'বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই', 'সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই' ইত্যাদি।

৪ঠা-২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের প্রস্তুতি-দিবস। এরইমধ্যে ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, ভাসানীর সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কর্মপরিষদ'-এর একটি সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ১১-১৩ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকা শহরে 'পতাকা-দিবস' এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালন করা হবে। 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালন করার জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারিকে নির্ধারণ করার মূলকারণ ছিল এদিন পূর্ব-বাংলা বিধান-পরিষদের বাজেট-অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা।

'সকল ভাষার সমমর্যাদা দান'-শ্লোগানটি ও পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী জাতির ভাষা ও কৃষ্টির উন্নতির সুযোগব্যবস্থার উপর জোর দিয়ে ভাষা-আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া জন্য ও ভাষা-আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার লক্ষ্যে, ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টির পূর্ব-বাংলা সংগঠনী কমিটি আরও একটি ইশতেহার প্রকাশ করে, এতে বলা হয়,

১. মজুরশ্রেণীর মধ্যে, বিশেষ করে বাঙালি-অবাঙালি রেলমজুরদের মধ্যে, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে মজুরশ্রেণী যাতে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে অগ্রসর হতে পারে, সেজন্য বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়ার প্রয়োজন। বাঙালি-অবাঙালি রেলমজুর রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হলে এ-আন্দোলন একটি নতুন পর্যায়ে রূপ নেবে। এতএব লিফলেট, পোস্টার ও ছোট ছোট বৈঠক-মারফৎ রেলমজুর এবং অন্যান্য মজুরশ্রেণীর মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা উচিত;

২. গ্রামাঞ্চলের কৃষকশ্রেণী যাতে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে এগিয়ে আসে সেজন্য বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার। গ্রামাঞ্চলের বাজারগুলিতেও যাতে ২১শে ফেব্রুয়ারির হরতাল পালিত হয় সেজন্য বিশেষ চেষ্টা নেওয়া প্রয়োজন। সভা, বৈঠকের মারফৎ ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা অবশ্যক;

৩. উর্দু ভাষাভাষী ছাত্র-শিক্ষক ও সাহিত্যিকের মধ্যে ভালভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রগতিশীল উর্দু সাহিত্যিক, শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছ থেকে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বিবৃতি আদায়ের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। উর্দু ভাষাভাষী জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে উর্দু ভাষায় প্রচারপত্র, পোস্টার ইত্যাদি তৈরি করার ব্যবস্থা করা উচিত;

---

[১৪৩] আহমদ রফিক, একুশের ইতিহাস/ আমাদের ইতিহাস, ১৯৮৮।
[১৪৪] দৈনিক আজাদ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।
[১৪৫] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব-বাঙালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১৯৭০।

৪. রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দল, প্রতিষ্ঠান ও শ্রেণীর প্রতিনিধিসহ জেলায় জেলায় ও স্থানীয়ভাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি গঠন করা দরকার;

৫. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির নেতৃত্বে ও উদ্যোগে ২১শে ফেব্রুয়ারি সম্বন্ধে প্রচার, সাধারণ ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রা করার ব্যবস্থা করা দরকার।[১৪৬]

একই ইশতেহারে আরও বলা হয় যে, ভাষা-আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালিত হলে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ একই মঞ্চে সমবেত হতে পারবে, এবং তা করতে পারলে ভাষা-আন্দোলনের ভিতর দিয়ে পাকিস্তানের প্রত্যেক ভাষাভাষী জাতির জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলনটিও এগিয়ে যাবে। এতএব ভাষা-আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। ইশতেহারের মাধ্যমে ভাষা-আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য এবং আন্দোলনকে সারা প্রদেশব্যাপী গণভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য প্রত্যেকটি পার্টি-ইউনিট ও পার্টিসভ্যদের সম্মিলিতভাবে কার্যকরী নকশা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।[১৪৭]

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, 'ছদ্ম ফ্যাসিজম'-শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে 'পাকিস্তান অবজার্ভার', এবং বলে, 'ইসলামের তৃতীয় খলিফা অত্যন্ত ধার্মিক ও সৎলোক ছিলেন; কিন্তু তিনি নির্লজ্জ আত্মীয়তোষণের অপরাধে অপরাধী ছিলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব যাঁদের দাবী আদৌ বিবেচনার যোগ্য ছিল না, তিনি তাঁদেরই নানারূপ ক্ষমতার অধিকারী করেছিলেন। খাজা নাজিমুদ্দীন ধার্মিক মুসলমান একথা কেউই অস্বীকার করবেন না, কিন্তু তিনি যেন নিজেকে দ্বিতীয় ওসমান-বিন-আফফান প্রমাণিত না করেন আমরা এই আশা এবং এই প্রার্থনাই করি।'[১৪৮] 'পাকিস্তান অবজারভার'-এর ওপর এরকম একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে সরকারের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় (১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)।

৪ঠা-২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, ঢাকা ছাড়াও পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়, যেমন– চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, ফেনী, কুমিল্লা, সিলেট, নোয়খালী, মানিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি। ছাত্ররা ছাড়াও সাধারণ মানুষ এসব বিক্ষোভে যোগ দেয়, মিছিল করে, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'-এর শ্লোগান তুলে। এরইমধ্যে ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্মসম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দীন আহমদ জেলবন্দী থাকা-অবস্থায় অনশন ধর্মঘট শুরু করেন, এবং সরকার ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, অনশন থাকা-অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমানকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করে।

২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ'-এর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টির পূর্ব-বাংলা সাংগঠনী কমিটি আরও একটি ইশতেহার প্রকাশ করে, এতে স্পষ্টভাবেই বলা হয় যে,

১. ইংরেজি ভাষাকে আর রাষ্ট্রভাষা রাখা চলবে না;

২. পাকিস্তানের সকল ভাষার সমমর্যাদা দিতে হবে;

৩. বাঙালি, পাঞ্জাবি, পাঠান, সিন্ধি, বেলুচি প্রভৃতি জাতিকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করার ও রাজকার্য পরিচালনা করার অধিকার দিতে হবে;

৪. বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।[১৪৯]

[১৪৬] পি ও পি সার্কুলার নং ১০, পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি, ১৯৫২।
[১৪৭] পি ও পি সার্কুলার নং ১০, পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি, ১৯৫২।
[১৪৮] বশীর আল্‌হেলাল, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৮৫।
[১৪৯] পূর্ববঙ্গ সাংগঠনী কমিটি, পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

কম্যুনিস্ট পাটির ইশতেহার থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, এ-পার্টি চায় বাংলার জন্য আন্দোলন মানেই উর্দুর বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়, এ হচ্ছে ইংরেজির পরিবর্তে উর্দু, বাংলাসহ সকল ভাষাকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সম্মানে সমমর্যাদা দেওয়ার আন্দোলন। ইংরেজ সরকার পাক-ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিকে পশ্চাৎপদ রেখে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা করেছিল। লীগ সরকারও একই উদ্দেশ্যে ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা হিশেবে চালু রেখে একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চায়। একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করলে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি পশ্চাৎপদ থেকে যাবে এবং এর ফলে পাকিস্তানের সামগ্রিক উন্নতিই ব্যাহত হবে। এতএব পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাকে সমমর্যাদা দান করতে হবে, এবং ভাষা-আন্দোলনে পাকিস্তানের বাঙালি, পাঞ্জাবি, পাঠান, সিন্ধি, বেলুচি– সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।[১৫০]

২১শে ফেব্রুয়ারি যত এগুতে থাকে ততই ছাত্রদের মধ্যে কর্মতৎপরতা বেড়ে যায়– 'লাল বর্ণমালা'র ঝড়-তোলা পোস্টারের কাজ চলে ছাত্রাবাসে; পোস্টার তৈরি করার কর্মশ্রমে যুক্ত হয় সাহাতউল্লা, জিয়া হাসান, নূরুল ইসলাম, বদরুল আলম, মশাররফ, রাব্বি, জাকির প্রমুখ; ইশতেহার ছাপানোর জন্য প্রেসে ছোটাছুটি, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও অন্যান্য কাজের জন্য ছাত্রকর্মীর অভাব হয় না।[১৫১] শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে ঠিক তখনই আরেকটি আঘাত আসে, ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, ঢাকার জেলা-ম্যাজেস্ট্রেট ১৪৪-ধারা ঘোষণা করে শোভাযাত্রা ও সভাসমিতি বন্ধ করার আদেশ দেয়, যদিও এর পূর্বে বিভিন্ন পর্যায়ের রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের অনেক সভা, হরতাল ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়, তবুও এসব কর্মকাণ্ড চলাকালে সরকারের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করার কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি, তবে এখন কেন? ছাত্ররা এ-হঠকারিতায় ভয়ানক বিক্ষুব্ধ হয়।[১৫২]

২০শে ফেব্রুয়ারি (সন্ধ্যা), 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কর্মপরিষদ'-এর একটি বৈঠকে সরকার-আরোপিত ১৪৪-ধারা না ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, রাজনৈতিক নেতাদের ইচ্ছায়। আসন্ন সাধারণ নির্বাচন ভণ্ডুল না করার জন্য নেতাদের যুক্তি ছিল, মুখোমুখি-সংঘর্ষ এড়িয়ে ১৪৪-ধারা না ভেঙে শান্তির পথে অগ্রসর হওয়া। বলা বহুল্য, ২০শে ফেব্রুয়ারির (বিকাল) নবাবপুরস্থ আওয়ামী লীগের অফিসে অনুষ্ঠিতব্য সভায় সর্বদলীয় নেতৃস্থানীয় নেতারা ১৪৪-ধারা না ভাঙার পক্ষেই মত প্রকাশ করেন। তাদের মতে, প্রয়োজনে সরকার সেনাবাহিনীও তলব করতে পারে। এসব খবর যখন শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন 'বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ'-এর সদস্যরা কাপুরুষের মত ভূমিকা নিতে অস্বীকৃতি জানান, কারণ তাদের অন্তর জুড়ে বিরাজ করে একটি চঞ্চলতা, একটি আতঙ্ক, একটি অসাধারণ জাগরণশক্তি; একইসঙ্গে তাদের আত্মাভরে অবস্থান করে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা। ২০শে ফেব্রুয়ারির (সন্ধ্যা) বৈঠকের নেতাদের সিদ্ধান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভয়হীন ছাত্ররা মেনে নিতে অসম্মতি জানালে শুরু হয় ছাত্রদের মধ্যেই তর্কবিতর্ক ও আলোচনা। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রাবাসে সংগ্রামমুখী ছাত্ররা উত্তেজনার মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আলোচনা শুরু করে।[১৫৩] ছাত্রকর্মীরা ছুটতে থাকে ঢাকা হলে ও ফজলুল হক হলে। আনোয়ারুল হক খান ও গাজীউল হকের সঙ্গে আলাপালোচানার মাধ্যমে একটি যৌথসিদ্ধান্তে পৌঁছানো অবশ্যক হয়ে পড়ে; কিন্তু সরকার-আরোপিত ১৪৪-ধারা ভাঙা যাবে কী না– এ-বিষয়ে একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব হওয়ায় পরের দিনের সভার মতামতের উপরই তা ছেড়ে দেওয়া হয়।[১৫৪]

[১৫০] পূর্ববঙ্গ সাংগঠনী কমিটি, পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।
[১৫১] আহমদ রফিক, একুশের ইতিহাস/ আমাদের ইতিহাস, ১৯৮৮।
[১৫২] সভাপতির ভাষণ: আতউর রহমান খান, সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ সম্মেলন, ২৭শে এপ্রিল ১৯৫২।
[১৫৩] দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ই ফাল্গুন ১৩৯২।
[১৫৪] আহমদ রফিক, একুশের ইতিহাস/ আমাদের ইতিহাস, ১৯৮৮।

৮ই ফাল্গুন, একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, বৃহস্পতিবার, ফুলার রোড ও তার আশপাশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চল ছিল কুয়াশায় আচ্ছাদিত, আলো-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, স্তব্ধতায় আবৃত, অসীমদীর্ঘ ভোর, ভীষণ নীরব, বসন্তের কোকিলও নিশ্চুপ, বসন্তসমীরণও মুক্তভাবে বইতে ভয় পায়; তবুও দু-একটি রিকশা যাতায়াত করে, দু-একটি গাড়িও। রশ্মিতেজী ছাত্রমন ভয়হীন, দ্বিধাহীন। মেডিক্যাল কলেজের কয়েকজন ছাত্র পিকেটিংয়ের পথে নেমে পড়ে। আলী আজমল, নওয়াব হোসেন ছাড়াও আরও কয়েকজন ছাত্র রাস্তায় জমায়েত হয়, তাদের লক্ষ হরতালের চেহারাটি একটু দেখে নেওয়া। বাংলা-বিরোধী 'মনিং নিউজ' পত্রিকার 'ভয়েস অব ন্যাশান' লেখা অস্টিনভ্যানটিকে আজমল ও তার সঙ্গীরা ধাওয়া করে, এমনকী তাদের হাত থেকে ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনগামী রিকশাটিও রেহাই পায় না। রোদ উঠতে থাকে। কলাভবনের আমতলার সভায় যোগ দেওয়ার লক্ষ্যে ব্যারাকের দক্ষিণ-পশ্চিম গেট দিয়ে, বকশী বাজারের দিক থেকে, নবকুমার স্কুলের এবং জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা একে একে জমায়েত হতে থাকে। পার্টিকর্মী মৃণাল বারি ও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র মঞ্জুর হোসেনের উচ্চকণ্ঠের হাসিও একুশের সকালের স্তব্ধতাকে অতিক্রম করতে পারে না। বেলা বেড়ে চলে। ছাত্ররা বিভিন্ন পথ ধরে কলাভবনের প্রাঙ্গণে এসে হাজির হয়; কেউ পেছনের রেললাইন ধরে, কেউ হাসপাতাল ও কলাভবনের মধ্যকার ভাঙা-পাঁচিল ডিঙিয়ে।

আস্তেধীরে আমতলায় ভিড় জমে ওঠে, স্কুল-কলেজের ছাত্রদের সমাবেশে। শুরু হয় আলোচনা, তর্কবিতর্ক; কেউ শান্ত গলায়, কেউ আবার উত্তপ্ত কণ্ঠে। মধুর ক্যানটিনে পরিচিত-বন্ধু ও পরিচিত-পরিবেশেও আলাপ জমে ওঠে, চলে তর্ক, সঙ্গে চা-সিগারেটে ধুম। তোয়াহ, অলি, মতিন, সুলতান, সামাদ, বারি, আনোয়ার, হাসান, রফিক ও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা নিজদের মত তর্কবিতর্কে লিপ্ত। আলোচনার বিষয় একটিই, ১৪৪-ধারা ভাঙা যাবে কী, না যাবে না। আজমল, শরফুদ্দীন, মঞ্জুর, সালাম, হুমায়ুন, রফিক, মশাররফ, মানাফ, কবির প্রমুখই ১৪৪-ধারা ভাঙার পক্ষে, মিছিলের পক্ষে; যদিও সলিমুল্লাহ হলে অনুষ্ঠিত সভায়, ছাত্রদের উপস্থিতিতে, ছাত্রলীগের কর্মীরা ১৪৪-ধারা ভাঙার অসুবিধাগুলি দৃঢ়কণ্ঠে ব্যক্ত করেন।

সরকার-আরোপিত ১৪৪-ধারা না-ভাঙার সিদ্ধান্ত সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সদস্যদের মধ্যে বহাল থাকলেও সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে শুরু হয় ১৪৪-ধারা ভাঙার প্রস্তুতি। কলাভবনের সামনে ছাত্ররা প্রস্তুত। রাস্তায় লাঠিহাতে সারিবদ্ধ সশস্ত্র পুলিশও প্রস্তুত। রাস্তার পাশে কয়েকটি পুলিশী জীপ ও ট্রাক স্থির অবস্থায় দাঁড়িয়ে। ঠিক এমুহূর্তে পুলিশের কী করা উচিত? উপর থেকে নির্দিষ্ট নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তারা ছাত্রদের তাড়া করতে পারে না। এরকম উত্তপ্ত মুহূর্তে আওয়ামী মুসলিম লীগের সেক্রেটারি শামসুল হক সাধারণ ছাত্রদের বোঝাতে শুরু করেন যে, সরকারের সঙ্গে এমুহূর্তে প্রত্যক্ষসংঘর্ষে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে ভবিষ্যৎ আন্দোলন ও অন্যান্য কাজে নিশ্চিতে অসাফল্যতা আসবে। খালেক নেওয়াজ খান ও কাজী গোলাম মাহবুব জোরালো গলায় তাকে সমর্থন জানান, এমনকী সমর্থন জানায় সলিমুল্লাহ হলের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ছাত্ররাও; কিন্তু অধিকাংশ পরিচিত ও অপরিচিত ছাত্রদের চোখেমুখে বিরক্তির ছায়াই সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়।[১৫৫]

গাজীউল হকের সভাপতিত্বে আমতলার সভা শুরু হলে শামসুল হক আবারও চেষ্টা করেন সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করতে, কিন্তু ১৪৪-ধারা না ভাঙার পক্ষে কিছুক্ষণ মন্তব্য প্রকাশ করার পর উত্তেজিত ছাত্রদের হৈচৈ তাকে নির্লিপ্ত থাকতে বাধ্য করে। কাজী গোলাম মাহবুবও চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনিও বিফল হন। মতিন তীব্র বক্তব্য রাখেন ১৪৪-ধারা ভেঙে মিছিল নিয়ে পরিষদ-ভবনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য; সামাদও একই সুর ধরেন, সেসঙ্গে প্রস্তাব রাখেন, দশ-দশজন করে মিছিল বের করে সুশৃংখলভাবে

[১৫৫] আহমদ রফিক, একুশের ইতিহাস/ আমাদের ইতিহাস, ১৯৮৮।

বেরিয়ে যাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে সমর্থনসূচক হাততালি ওঠে ছাত্রদের মধ্য-থেকে। ১৪৪-ধারা ভাঙার প্রস্তাব গৃহীত হলে, উপস্থিত ছাত্রদের অস্থিরতার কারণে, সভার কাজ দ্রুত শেষ করে সভাপতি গাজীউল হক তার সংক্ষিপ্তভাষণ শেষে ১৪৪-ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন; সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশিত হয়– 'ভাঙতে হবে', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই' ইত্যাদি। গগন-বিদারী এসব হাঁকে আমতলা-বেলতলা সরগরম হয়ে ওঠে।[১৫৬]

মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় সংকল্পে শুরু হয় ১৪৪-ধারা অমান্য করে ভাষা-আন্দোলন– খণ্ড খণ্ড মিছিল ও ঠাণ্ডাশান্তি মুখে উত্তপ্ত শ্লোগান। পুলিশের বাধা সৃষ্টি হয়, তবে সুসজ্জিত পুলিশবাহিনী ছাত্রদের অবস্থান সামলাতে অক্ষম; তাই হাতের কাছে যাকে পায় তাকেই তুলে নেয় অপেক্ষমান ট্রাকে। নির্ভয়, স্বেদাক্ত দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে, মাথার উপরে উঁচু করে মুষ্টিবদ্ধ হাতে নির্দেশ দিতে থাকেন আনোয়ার, আলী আজমল, সামাদসহ কয়েকজন চেনা-অচেনা ছাত্রনেতা ও কর্মী। শুরু হয় পুলিশী বিশৃঙ্খলা, আর ছাত্রদের খণ্ড খণ্ড মিছিল; ছাত্ররা বেরুতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে, বেরিয়েও পড়ে; কিন্তু পুলিশবাহিনী তাল সামলাতে পারে না, তাই তারা শুরু করে চিরাচরিত পুলিশীব্যবস্থা– লাঠিচার্জ, কাঁদুনে-গ্যাস নিক্ষেপ। বৃষ্টির মত ইট-পাটকেল নিক্ষেপের মাধ্যমে পাল্টা জবাবও দেয় স্কুল-কলেজের ছাত্ররা। শান্তিরক্ষার দল এরকম ছাত্রপ্রতিরোধ আশা করেনি, তাই ভীত-শঙ্কিত পুলিশবাহিনী কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ছুঁড়তে থাকে দ্রুত গ্যাসের-পর-গ্যাসের শেল; ক্রমাগত বাতাস বিষাক্ত হতে থাকে, আমতলা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন; একইসঙ্গে চলে লাঠিচার্জের ধূমধাড়াক্কা। ছাত্ররা ছুটে– বেলতলার ডোবায়, রেললাইনের দিকে, তারকাঁটার বেড়া ডিঙিয়ে একেবারে খেলার মাঠে, মধুর ক্যানটিনের পাশ-দিয়ে ভাঙা-পাঁচিল ডিঙিয়ে একেবারে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে। এরইমধ্যে হতভম্ব পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে একটি মিছিল ছুটে যায় মেডিক্যাল কলেজের গেটের দিকে; সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিহীন সরকারি পুলিশবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাত্রদের উপর, আক্রমণ-হামলা চলে ইচ্ছামত।

সমস্ত দুপুর ধরে, সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চল জুড়ে, চলে ছাত্র-জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ; দুপুর গড়িয়ে চললেও লড়াই শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই, বরং কাঁদুনে-গ্যাসের মাত্রা বেড়ে চলে, ছাত্রদের দিক থেকেও পাল্টা জবাব আসে। বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় জনসংখ্যাও বেড়ে ওঠে, পুলিশের দিক থেকে আরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটার লক্ষণ দেখা দেয়, তাদের পক্ষ থেকে অবিরাম কাঁদুনে-গ্যাস বর্ষণ ও লাঠিচার্জের প্রবণতা বাড়তে থাকে, এসত্ত্বেও ছাত্র-জনতার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ক্রমেই জোরাল হতে থাকে। ছাত্রদের প্রাণপণ চেষ্টা, যে-করেই হোক প্রাদেশিক পরিষদ-ভবনে পৌঁছানো চাই-ই-চাই, আর পুলিশের আপ্রাণ চেষ্টা লাঠি ও কাঁদুনে-গ্যাসের সাহায্যে ছাত্র-প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করা।[১৫৭]

পুলিশী জুলুমের শিকার হয়েও ছাত্ররা ১৪৪-ধারা লংঘন করে প্রাদেশিক পরিষদ-ভবনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ছাত্রদের সঙ্গে যুক্ত হয় রাস্তা-সংলগ্ন হোস্টেল-রেস্টুরেন্টেরের বেয়ারা, পথচারী, রিকশাওয়ালা প্রমুখ। আন্দোলন রূপান্তরিত হয় ছাত্র-জনতার সম্মিলিত সংগ্রামে, এবং তারাই সম্মিলিতভাবে পুলিশী জুলুমের শিকার হতে থাকে। পরিষদ-ভবনে যাওয়ার পথে ই.পি.আর মেশিনগান পোস্ট ও কাঁটাতারের ব্যারিকেড বসানো হয়। ছাত্র-জনতার শোভাযাত্রীর দলটি মেডিক্যাল হোস্টেল থেকে বেরিয়ে বার বার সেই ব্যারিকেড অতিক্রম করে পরিষদ-ভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। একসময় মেডিক্যাল কলেজের মোড়ে ছাত্র-জনতার ওপর ঢাকার তদানীন্তন অবাঙালি ডিসি কোরেশী এবং সিটি এসপি মাসুদের কর্তৃত্বাধীন পুলিশবাহিনী গুলি চলাতে থাকে। গুলি চলে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলেও। মেডিক্যাল ছাত্রাবাসের ভিতর সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী অনধিকারপ্রবেশ করে নিরস্ত্র ছাত্রদের

[১৫৬] আহমদ রফিক, একুশের ইতিহাস/ আমাদের ইতিহাস, ১৯৮৮।
[১৫৭] আহমদ রফিক, একুশের ইতিহাস/ আমাদের ইতিহাস, ১৯৮৮।

উপর লাঠিচার্জ, কাঁদুনে-গ্যাস নিক্ষেপ, গ্রেফতার, বেপরোয়া গুলিবর্ষণ শুরু করে। একুশের এ মর্মন্তুদ ও শোকাবহ দৃশ্যটি সম্পর্কে আতউর রহমান খান বলেন, 'কারবালার দৃশ্যকেও হার মানিয়ে দিয়েছে।'[১৫৮] এমন দৃষ্টান্ত সভ্যবিশ্বে বিরল। মায়ের ভাষার মান রক্ষার জন্যে পুলিশের বন্দুকের গুলি হাসিমুখে বাঙালি ছাত্র ও সাধারণ জনতা বুকে তুলে নেয়; নিহত হন ঢাকার সালাম, জব্বার, বরকত ও বাদামতলী কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের ছেলে রফিক; আরও কত তরুণতাজা প্রাণ নিহত হয়েছে তার হিশেব উদ্ধার করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আবদুস সালামের নিবাস ছিল লক্ষ্মীপুর, ফেনি, আর তার পিতা ছিলেন ফাজিল মিয়া।[১৫৯] আবদুস সালাম হাসপাতালে রুগী ভর্তি করতে এসে তার বন্ধুর রুমে উঠেন। রুম থেকে বেরিয়ে এলে গুলির আঘাতে তিনি মাটিতে পড়ে যান। উপস্থিত কয়েকজন ছাত্র তাকে ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে এলে ইমারজেন্সিতেই তার মৃত্যু ঘটে।[১৬০]

শহীদ আবদুল জব্বরের বাড়ি ছিল ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও থানার পাচুয়া গ্রামে। থানা-সদর থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে এ-গ্রামেই জব্বার আশ্বিন ১৩২৬ বাংলায় একটি দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন হাছেন আলী, মাতা সাফাতুন্নেছা, স্ত্রী আমেনা খাতুন এবং সন্তান নজরুল ইসলাম বাদল। সাত ভাইবোনের মধ্যে জব্বার ছিলেন সবার বড়। গ্রামে অল্প লেখাপড়া করা কিশোর জব্বার একা-একাই একদিন ট্রেনে চেপে নারায়ণগঞ্জ চলে এসে এক ইংরেজের সান্নিধ্যে বার্মা গিয়ে বছর দশেক চাকরি করেন। এজন্যই তিনি ইংরেজি বলতে পারতেন।[১৬১] হাসপাতালে ভর্তি-করা শাশুড়ির দেখাশোনার জন্য ঢাকায় এসে দুপুরবেলা শাশুড়ির জন্যে ডাব কিনতে গিয়ে ব্যারাকের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালের পথে মারা যান।

পশ্চিম-বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার বাবলা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন তরুণ আবুল বরকত। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করে তালিবপুর হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা ও বহরমপুর কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে বি. এ. অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি হন। শুরুতে তিনি আশ্রয় পান মামা আবদুল মালেকের আজিমপুরের বাসায়, পরে ছাত্রাবাসে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। দ্বিতীয় পর্যায়ের রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের শুরু থেকেই তিনি সক্রিয়ভাবে এতে অংশগ্রহণ করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ (বিকাল), ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনে ছাত্রমিছিলে গুলিবিদ্ধ হয়ে রাত ৮টায় মারা যান। আজিমপুর গোরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর থানা-সদর থেকে প্রায় ৮ মাইল দূরে সিংগাইর-বলধারা সড়কের পাশে উত্তর পারিল গ্রাম, এখানেই ৩০শে অক্টোবর ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ রফিকুদ্দীন আহেমদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাবা-মার প্রথম সন্তান। দেশ-বিভাগের কয়েক বছর পর তিনি সিংগাইরের বায়রা স্কুল থেকে প্রবেশ-পরীক্ষা পাশ করে মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে বাণিজ্য-বিভাগে ভর্তি হন। উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করার পর তিনি জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন। এসময় তিনি বাবুবাজারে পিতার প্রেসব্যবসা দেখাশোনার পাশাপাশি ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। হুমায়ুন কবির বলেছেন,

> গুলিচালনা স্বচক্ষে দেখেছি। বিকাল ৩টার দিকে মেডিক্যাল হোস্টেলের গেটের কাছে একজনকে শহীদ হতে দেখেছি। মাথার খুলি উড়ে যাওয়া একজন শহীদের লাশ আমরা ধরাধরি করে প্রথমে ইমারজেন্সিতে, পরে এনাটমি হলের বারান্দায় নিয়ে আসি। তার একটি ফটোও নেওয়া হয়, এবং সে ফটোর কপি আমার

[১৫৮] সভাপতির ভাষণ: আতউর রহমান খান, সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ–সম্মেলন, ২৭ এপ্রিল ১৯৫২।
[159] Government of East Pakistan, Home Department, record No. 14710-Pol., 30 November 1956.
[১৬০] আহমদ রফিক, একুশের ইতিহাস/ আমাদের ইতিহাস, ১৯৮৮।
[161] Government of East Pakistan, Home Department, record No. 14710-Pol., 30 November 1956.

কাছে ছিল। পরবর্তীকালে তা ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়। অধুনাপ্রখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী আমানুল হকও তুলেছিলেন রফিকের লাশের ছবি। কিন্তু তখন রফিকের পরিচয় আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট কেউ শনাক্ত করতে পারেননি।

প্রথমে বুঝতে পারিনি ওরা গুলি চালিয়েছে। মনে হয়েছিল, টিয়ার গ্যাস ফুটেছে। তাকিয়ে দেখি ১৭-নম্বর ব্যারাকের পূর্বদিকে পড়ে আছে একটি ছেলে। ১৬/১৭ বছরের ছেলে। ততক্ষণে আরো কয়েকজন এগিয়ে এসেছেন। ছয় সাত জনে ধরাধরি করে লাশটা নিয়ে এলাম এনাটমি হলের পিছনের বারান্দায়। সঙ্গীদের মধ্যে ডা. মশাররফুর রহমান খানের কথাই মনে আছে। সে লাশের মগজটা তুলে ছিল দুই হাতে।[১৬২]

২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনা সমস্ত দেশের নরনারীর মনে শোকের ছায়া ফেলে। একুশের নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি বাসিন্দা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে, ফলে বন্ধ হয়ে যায় ঢাকার কল-কারখানা, অফিস-আদালত, রেডিও স্টেশন, রেলগাড়ির চাকা। এমনকী সিলেটের গোবিন্দ পার্কেও 'সিলেট জেলা রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ'-এর আহ্বানে ও মাহমুদ আলীর সভাপতিত্বে একটি জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়, এবং এ-সভায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ও আরবি-হরফে বাংলা-প্রচলনের গোপন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা প্রকাশ করা হয়; এছাড়াও নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও রাজশাহীতে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঢাকা শহরে ধর্মঘট পালিত হয়। সকাল ৮টায় মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাস প্রাঙ্গণে শহীদদের উদ্দেশ্যে, সর্বস্তরের প্রায় ত্রিশ হাজার লোক এবং মওলানা ভাসানী ও শেরে বাংলা ফজলুল হকের অংশগ্রহণে, একটি গায়েবী জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজার পর বিপ্লবী জনতার একটি মিছিল রাজধানীর রাজপথ কাঁপিয়ে তুলে, একইসঙ্গে জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়– 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'উর্দু-বাংলার বিরোধ নাই', 'খুনী নূরুল আমীনের বিচার চাই', 'খুনের বদলা খুন চাই' ইত্যাদি। মিছিল চলাকালে পুলিশের বেপরোয়া গুলির আঘাতে কয়েকজন নিহত ও অজ্ঞাত সংখ্যক মানুষ আহত হয়। এদিন শহীদ হন শফিউর রহমান, রিকশাচালক আউয়াল (বয়স ২৬, পিতা মো. হাশিম, ঢাকার বাসিন্দা) ও কিশোর অহিউল্লাহ।

২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, সকাল ১১টায় একটি মিছিল নওয়াবপুর রোড দিয়ে, মরণচাঁদের দোকানের সামনে এলে শফিউর রহমানের পিঠে গুলি লাগে, তবুও তিনি সাইকেল চালিয়ে খোশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে এসে পৌঁছেন, কিন্তু তার পক্ষে আর এগুতে সম্ভব হয় না, সাইকেল থেকে মাটিতে পড়ে যান। তাকে ধরাধরি করে রেস্টুরেন্টে আনা হয়। তারপর অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়। হাসপাতালে যাওয়ার পথে, বেলা আড়াইটার দিকে, শফিউর রহমানকে তার বাসায় আনা হয়। শহীদ শফিউর রহমান ছিলেন বিবাহিত, শিশুকন্যার পিতা ও হাইকোর্টের একজন কর্মচারী। শফিউর রহমানের বাসায় তখন ছিলেন তার মা, স্ত্রী (আকলিমা বেগম), মেয়ে (শাহনাজ) ও ছোট ভাই (তৈয়বুর রহমান)। তৈয়বুর রহমানের স্মৃতি অনুযায়ী,

ইশারা করে বড়ভাই মাকে ডাকলেন, দু'হাত বাড়িয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলেন। মায়ের কাপড়ে রক্ত লেগে গেল। এরপর আমাকে ডাকলেন। ভাবী চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। এরপর ভাইকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হলে সন্ধ্যায় তিনি মারা যান। গুলিতে ভাইয়ের কলিজে ছিঁড়ে গিয়েছিল। অপারেশন সফল হয়নি তাই। সেদিন রাত তিনটায় আজিমপুরে তাকে দাফন করা হয়। তবে অনেক ধরাধরি করে আমরা লাশের কাফন পরিয়ে দিয়েছিলাম।[১৬৩]

[১৬২] আহমদ রফিক, একুশের ইতিহাস/ আমাদের ইতিহাস, ১৯৮৮।
[১৬৩] দৈনিক বাংলা, ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮০।

শফিউর রহমানের শাহাদাতের তিন মাস পরে তার একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। বরকত ও শফিউর রহমান ছাড়া আর কারো সমাধিস্থান খোঁজে পাওয়া যায়নি। ভাষা-শহীদদের কবর হারিয়ে গেছে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তে। ছাত্র-জনতা পরিবার-পরিজন কেউ কবর দেওয়ার জন্য শহীদদের লাশের সন্ধান পাননি।

২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, পূর্ব-বাংলা বিধান-পরিষদের তৃতীয়দিনের বাজেট-অধিবেশনের সমাপ্তির পর নূরুল আমীন সরকারের সমর্থক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ও ছাত্রদের উপর সরকারি পুলিশের বর্বরতার প্রতিবাদে, পূর্ব-বাংলা বিধান-পরিষদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন। সরকারের ভূমিকা লজ্জাজনক বলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের সঙ্গে সংযুক্ত এবং পরিষদের সদস্য হিশেবে বহাল থাকতে তিনি লজ্জাবোধ করেন।[১৬৪]

২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, আবুল কাশেম ফজলুল হকের সভাপতিত্বে ঢাকা হাইকোর্ট বার এ্যাসোসিয়েশনের একটি জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়, এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশের প্রবেশ ও গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা জানানো হয়; এছাড়াও নিহত ও আহত ছাত্র-জনতার প্রতি শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করা হয়, একইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে পুলিশ প্রত্যাহার করা, হাইকোর্টের বিচারপতিগণের নেতৃত্বে গুলিবর্ষণের ঘটনার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা ও বাংলা ভাষাকে একটি রাষ্ট্রভাষা হিশেবে ঘোষণা করার দাবী জানানো হয়।[১৬৫]

২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, সকল রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের কাছে আবেদন জানানোর লক্ষ্যে পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির পূর্ব-বাংলা সংগঠনী কমিটি একটি লিখিত বিবৃতি প্রকাশ করে বলে যে, গণসংগ্রামে সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করে দেশের প্রতি 'নিজেদের দায়িত্ব পালন' করুন ও জনতার দাবী মানতে সরকারকে বাধ্য করুন। ছাত্র, জনসাধারণ ও সংগ্রাম-পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির পূর্ব-বাংলা সংগঠনী কমিটি আরও ঘোষণা করে যে,

১. অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার ও সকল ভাষার সমান মর্যাদা দিতে হবে;

২. গুলিবষর্ণের জন্য বেসরকারি তদন্ত-কমিশন গঠন করতে হবে;

৩. ১৪৪-ধারা ও মিলিট্যারি প্রত্যাহার করতে হবে;

৪. শহীদের ক্ষতিপূরণ দিবে হবে;

৫. বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে;

৬. নিরাপত্তা আইন নাকচ করতে হবে;

৭. নূরুল আমীন সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে।[১৬৬]

২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ (রাত), বরকত যেখানে শহীদ হন সেখানে একটি 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ' নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি, কার্ফিউ থাকা সত্ত্বেও, বিকাল থেকেই শুরু হয় ইটবালি সংগ্রহ করার কাজ, তবে ইটবালির কোনো অভাব ছিল না, কারণ মেডিক্যাল কলেজ সম্প্রসারণের জন্য প্রচুর ইটবালি হাতের কাছেই ছিল। মেডিক্যাল হোস্টেলের প্রায় তিনশ' ছাত্রই কোনো-না-কোনো কাজে লিপ্ত ছিল– ইট বয়ে আনা, বালির সঙ্গে সিমেন্ট মিশানো, রাজমিস্ত্রির সহকর্মীর হিশেবে কাজ করা ইত্যাদি।

[১৬৪] দৈনিক আজাদ, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

[165] Government of East Bengal, B-Proceedings, Political Department, Political Brach, Bangladesh National Archieves, Bundle 65, No. 821, October 1952.

[১৬৬] ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ/ কতিপয় দলিল, প্রথম খন্ড, ১৯৮৪।

সাঈদ হায়দারের নকশায়, ২৩শে ফেব্রুয়ারি (রাত) শহীদ মিনার নির্মাণকাজটি বিশদভাবে শুরু হয়। নির্মাণকাজ শেষ হলে দড়ি দিয়ে ঘিরে-রাখা 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ'টির গায়ে সাঈদ হায়দারের নকশাটি টাঙিয়ে দেওয়া হয়। শরফুদ্দীন ও বদরুল আলম 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ' নির্মাণকাজে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন; এছাড়া মওলা, হাশেম, জাহেদ, আলিম, জিয়াসহ ছাত্ররা ও বয়বেয়ারারা শহীদ মিনার নির্মাণকাজে প্রচুর পরিশ্রম করেন। নকশায় ছিল সাড়ে ৯-ফুট কিন্তু বাস্তবে মূল-পরিকল্পনাকে ডিঙিয়ে ১১-ফুট নির্মিত হয়। বদরুল আলমের হাতে লেখা 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ' কথাটি মিনারের গায়ে সেঁটে দেওয়া হয়। বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজের শহীদ মিনারটির কাছাকাছিই তৈরি করা হয় প্রথম 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ'।

২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি ক্ষমতাসীন পূর্ব-বাংলা প্রাদেশিক সরকারকে দিশেহারা করে দেয়, ফলে এসব পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনারা জন্য সরকার সরকারিভাবে বিভিন্ন প্রচারণামূলক ব্যবস্থা নেয়। সরকারের প্রচারণামূলক ব্যবস্থার অংশ হিশেবে, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব-বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির ও মুসলিম লীগ সংসদীয় পার্টির দুটি পৃথক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব-বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গৃহীত হয় যে,

১. পুলিশের গুলিবর্ষণে ছাত্র-জনতার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটাতে এ-সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে, এবং মৃতব্যক্তিদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি ও আহত ব্যক্তিদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে;

২. এ-সভা পূর্ব-বাংলা সরকারের কাছে দাবী করছে যে, এ-সম্পর্কে অবিলম্বে হাইকোর্টের বিচারপতিগণের দ্বারা একটি তদন্ত কমিটি গঠনের আদেশ দেওয়া হোক, এবং যারা দোষী সাব্যস্ত হবে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক;

৩. এ-সভা সরকারের কাছে আরো দাবী করছে যে, মৃতব্যক্তিদের পরিবারবর্গকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা হোক;

৪. এ-সভা ছাত্র ও জনসাধারণের কাছে ধৈর্যধারণ করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করার এবং উত্তেজক পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য আবেদন জানাচ্ছে;

৫. এ-সভা মুসলিম লীগের ইউনিটসমূহের প্রতি ও লীগ কর্মীদের প্রতি কর্তব্য পালনে অগ্রসর হওয়ার এবং আইন ও শৃঙ্খলা পুনরায় আনয়নের জন্য কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছে।[১৬৭]

আর মুসলিম লীগ সংসদীয় পার্টির সভায় গৃহীত হয় যে,

১. মুসলিম লীগ সংসদীয় পার্টির এ-সভায় পার্টির নেতা নূরুল আমীনের উপর আস্থা জ্ঞাপন করছে;

২. এ-সভা গত ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকার বুকে গুলিবর্ষণের ফলে ছাত্রসহ যে পাঁচ ব্যক্তি নিহত হয়েছেন তাদের জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে, যারা আহত হয়েছেন তাদের জন্যও এ-সভা গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছে;

৩. এ-সভা দাবী করছে যে, একজন হাইকোর্টের জজের সভাপতিত্বে একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করার যেকথা প্রধানমন্ত্রী পরিষদ ভবনে ঘোষণা করেছিলেন, তা যেন অনতিবিলম্বে গঠন করা হয় এবং গুলিবর্ষণ ব্যাপারে তাদের যেন পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করেন। সভা আরো দাবী করছে যে, দোষী ব্যক্তিদের যেন আদর্শ শাস্তি দেওয়া হয়;

৪. পার্টি সরকারের কাছে এ-দাবী পেশ করছে যে, বর্তমান উত্তেজক পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যেন শহরের ১৪৪-ধারা তুলে নেওয়া হয়।[১৬৮]

[১৬৭] মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাব, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।
[১৬৮] মুসলিম লীগ সংসদীয় পার্টির প্রস্তাব, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, পূর্ব-বাংলা পরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার অনুকূলে প্রস্তাব গৃহীত হয়। দুপুরে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ভাষা-শহীদদের উদ্দেশ্যে, প্রায় চার হাজার লোকের সমাবেশে, অনুষ্ঠিত হয় গায়েবী জানাজা। অন্যদিকে ঢাকায় পূর্ণ-ধর্মঘট ও অর্ধদিবস (বেলা ১টা পর্যন্ত) রেলধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদদের জীবন বলী দিয়ে অর্জিত অম্লান ভাষা-আন্দোলনের সংকল্পকে বাস্তবতায় পরিণত করার বাসনায়– অর্থাৎ শহীদদের রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে– সকল দল ও সকল মতের শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতা দ্বিধাদ্বন্দ্ব-অনৈক্য ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে লীগ সরকারের পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির পূর্ব-বাংলা সংগঠনী কমিটি, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, আরও একটি বিবৃতি প্রকাশ করে, এতে বলা হয় যে,

১. গুলিবর্ষণের জন্য বেসরকারি তদন্ত চাই;

২. সালাম-জব্বার ও অন্যান্য বীরদের হত্যাকারীদের বিচার চাই;

৩. নিহত ও আহতদের ক্ষতিপুরণ চাই;

৪. ১৪৪-ধারা প্রত্যাহার করা চাই;

৫. নিরাপত্তা আইন নাকচ করা চাই;

৬. অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও সকল ভাষার সমান মর্যাদা চাই;

৭. রাজবন্দীদের মুক্তি চাই;

৮. নূরুল আমীন মন্ত্রিসভার পদত্যাগ চাই।[১৬৯]

বিবৃতিতে আরও বলা হয় যে, যতদিন পর্যন্ত বেসরকারি তদন্ত কমিটি গঠন করা, ১৪৪-ধারা উঠিয়ে নেওয়া, বন্দীদের মুক্তি দেওয়া না হবে ততদিন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ হরতাল চলবেই; এরসঙ্গে বাঙালির সমস্ত দাবী আদায় করার জন্য এ-লড়াইকে বস্তিগ্রামগঞ্জের কৃষক-শ্রমিকের গৃহসহ সমস্ত পূর্ব-বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। কলকারখানায় ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রা করে দাবীগুলি অমোঘ করে তুলতে হবে। পাড়া-মহল্লা-গ্রাম-গঞ্জ-স্কুল-কলেজে সকল দলের, সকল মতের মানুষের মিলিত সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রয়োজনে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে শহীদদের প্রেরণায় গড়ে তুলতে হবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, যারা পূর্ব-বাংলায় সংগ্রামের বাণী ছড়াবে এবং সালাম-বরকত-জব্বার-রফিক প্রমুখ বীরদের হত্যার যোগ্য জবাব আদায় করবে।[১৭০]

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ (সকাল), মাতৃভাষার দাবীতে যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের জন্য আবেগে, অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হৃদয়মন নিয়ে জাতি-ধর্ম-পেশা-শ্রেণী নির্বিশেষে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরীর স্রোততরঙ্গ ভেঙে পড়তে থাকে 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ'টি ঘিরে। তারা শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন, সমস্ত প্রকৃতি যেন ফুলে ঢেকে যায়। ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, সাঈদ হায়দারের নকশায় ও বদরুল আলমের লেখায় মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে নির্মিত প্রথম 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ'টি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউর রহমানের পিতা। ২৪শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে এ 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ'টি হয়ে ওঠে বাঙালির সংস্কৃতির তীর্থকেন্দ্র।

[১৬৯] ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ/ কতিপয় দলিল, প্রথম খন্ড, ১৯৮৪।
[১৭০] ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ/ কতিপয় দলিল, প্রথম খন্ড, ১৯৮৪।

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, হরতাল অনুষ্ঠিত হয় । একইসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি, কর্মচারী সমিতি ও কার্যকরী পরিষদ স্বতন্ত্রভাবে জরুরি সভা আহ্বান করে ২১শে ফেব্রুয়ারির ছাত্র-জনতার উপর গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে । শিক্ষক সমিতির সভায় বলা হয়,

1. That this meeting requests the Government of Pkistan to declare immediately that Bengali is accepted as one of the State languges of Pakistan.
2. That this meeting requests the University of Dacca to take steps to introduce Bengali as a medium of instruction as far as practicable.
3. That this meeting of the Association condemns the outrageous murders and assults of the students on the 21st of February and subsequent days by the Police and the military and condemns the violation of the sanctity of University premises and requests the Executive Council to close the University as a protest for one day.
4. That this meeting records the protest against the entry of the Police into the University premises and the tear-gassing of and assualt on students and members of the staff of the University.
5. That this meeting demands that a judicial Enquiry Committee presided over by a High Court Judge be consituted immediately to equire into the happenings of the 21st February and subsequent days.
6. That this meeting demands immediate suspension of officers who were responsible for the happenings of the 21st February and subsequent days.
7. That this meeting demands immediate withdrawal of Sec. 144 from the city.
8. That this meeting demands immediate withdrawal of Police pickets and the military from the city and to banning of the entry of the Police and the military into the premises of educational institutions without the previous written permission of the Heads of the institutions.
9. That this meeting demands the removal of all restrictions on press immediately.
10. That this meeting demands that adequate compensation be given to the families of killed and to the injured.
11. That this meeting demands that the arrested persons be immediately and unconditionally released and pending their release facilities be given to the authorities of educational institutions, friends and relations of arrested persons to visit them in Jails.
12. That copies of these resolutions be sent to the Government, the Vice-Chancellor and the press.[171]

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা, ছাত্র-জনতার উপর বর্বরোচিত অত্যাচারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ ও নিহতদের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনাজ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যে বারহাল হাইস্কুলে একটি পূর্ণ ছাত্র-ধর্মঘট পালিত ও স্কুলের মাঠে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয় ।[১৭২]

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ (রাত), ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে পূর্ব-বাংলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন,

> পূর্ব-বাংলা আইন পরিষদ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করা সত্ত্বেও শান্তি ও শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য ছাত্রবৃন্দ ও জনসাধারণকে সুপরিকল্পিতভাবে উস্কানী ও প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে । এ-সকল ঘটনা এবং এর পদ্ধতি থেকে এই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যারা এ প্ররোচনা ও উস্কানী দিচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টি করা । [...] গত তিন চার দিন যাবৎ ঢাকা শহরে কয়েকটি

[171] University of Dhaka, Bundle 54, No. 190, 1952.
[172] Government of East Bengal, B-Proceeding, Police Deaprtment, No. 535, May 1952.

অবাঞ্ছিত ও দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে জনসাধারণের মধ্যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এ-সম্পর্কে আপনাদের কাছে পরিষ্কারভাবে আমি কিছু বলা দরকার বলে মনে করছি। [...] বাংলা ভাষার আন্দোলন সম্পর্কে জনমতের কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশ্যে ১৪৪-ধারা জারি করা হয়েছে বলে যে-অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। জেলা কর্তৃপক্ষ ১৪৪-ধারা জারি করেন শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের মোকাবেলা করতে। [...] অনেক তথ্য সরকারের নিকট আছে, এতে দৃঢ়ভাবে বলা যেতে পারে যে, আপাত দৃষ্টিতে বাইরে থেকে যা দেখা যাচ্ছে প্রকৃত পরিকল্পনা তার চেয়ে অনেকাংশে ও বহুগুণে মারাত্মক। এই মারাত্মক পরিকল্পনার যারা প্রণেতা, তারা পাকিস্তানের বাইরে থেকে সহায়তা এবং অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। এরূপ অবস্থায় পাকিস্তানের স্থায়িত্ব নষ্ট করার এসব মারাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে সরকারকে সময় সময় যথাবিহীত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।[১৭৩]

পূর্ব-বাংলা সরকার ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে 'পরিষ্কারভাবে কিছু বলা দরকার' বলে যে ঘোষণা দেয়, তারই অংশ হিশেবে সরকার একটি প্রেসবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, এতে বলা হয় যে,

১. ফেব্রুয়ারির ঘটনা সম্বন্ধে দৈনিক কাগজে যেসব খবর প্রকাশিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা;

২. নিরীহ জনতার উপর সামরিকবাহিনীর গুলিবর্ষণ ও লাঠি চার্জের খবরগুলি হচ্ছে উত্তেজনামূলক মিথ্যা প্রচারণা;

৩. ফেব্রুয়ারির ঘটনায় আহত ও নিহতদের প্রতি সমবেদনা প্রদর্শন করার জন্য হরতাল পালিত হয়েছে;

৪. ১৪৪-ধারা জারি করার সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভাষার কোনো সম্পর্ক নেই, ইত্যাদি।[১৭৪]

আরেকটি সরকারি প্রচারণা প্রকাশিত হয় 'মিথ্যা গুজবে বিশ্বাস করিবেন না'-শিরনামে, এতে বলা হয় যে,

১. এ-মর্মে গুজব রটানো হচ্ছে যে, গুলিতে নিহত ব্যক্তিদের মৃতদেহ পেট্রোল দ্বারা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আবার এরূপও বলা হচ্ছে যে, বিনা জানাজা ও কাফনেই লাশ দাফন করা হয়েছে। আবার গুজব ছড়ানো হচ্ছে যে, বহু লোক নিহত হয়েছে। এ-ধরনের প্রচারকার্যের মূলে কোনো সত্যই নেই। মৃতব্যক্তিদের লাশ শরিয়ত-সম্মতভাবে কাফন পরিয়ে ও জানাজা দিয়েই রীতিমত দাফন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ৫জন নিহত হয়েছে, এর মধ্যে ৩জন ছাত্র;

২. এ-মর্মে আরো একটি গুজব প্রচার করা হচ্ছে যে, বগুড়ায় গুলিচালনা করা হয়েছে এবং তিন ব্যক্তি সেখানে নিহত হয়েছে। সিলেটে গুলিচালনা সম্পর্কেও অনুরূপ একটি সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এ-সংবাদ একবারেই ভিত্তিহীন। বগুড়া বা সিলেটে এরূপ কোনো ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়নি, বস্তুত ঢাকা ব্যতীত প্রদেশের অন্যকোনো স্থানেই গুলিচালনা হয়নি;

৩. গুজব রটনাকারীরা এ-মর্মেও এক গুজব ছড়াচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনের ময়মনসিংহের বাড়ি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করা হয়েছে। এ গুজবের মূলেও কোনো সত্য নেই। ময়মনসিংহে আদৌ অনুরূপ কোনো গোলযোগ অনুষ্ঠিত হয়নি;

৪. কোনো কোনো সংবাদপত্র এ-ধরনের সংবাদও প্রচার করেছে যার দ্বারা বোঝানোর প্রয়াস হয়েছে যে, ঢাকার অবাঞ্ছিত গোলযোগের ফলে বাঙালি অবাঙালি বিরোধের ভাব জাগ্রত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন হয়েছে বলেও গুজব প্রচার করা হচ্ছে। এ-প্রচারকার্যও একবারেই ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে সেখানকার হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-অবাঙালি নির্বিশেষে সকল নাগরিকই একান্ত বন্ধুভাবে ও সম্প্রীতির সঙ্গে পরস্পর পাশাপাশি বাস করে আসছে। কোনো ঘটনাতেই এ-সম্প্রীতির বন্ধন বিন্দুমাত্র শিথিল হয়নি।[১৭৫]

[173] Government of East Bengal, B-Proceedings, Political Department, No. 607, 1952.
[174] Government of East Bengal, B-Proceedings, Political Department, Political Brach, Bundle 51-52, No. 607, 1952.
[১৭৫] ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে সরকারি প্রচারণা, মিথ্যা গুজবে বিশ্বাস করিবেন না, ১৯৫২।

সরকার যতই চেষ্টা করুক না কেন সচেতন বাঙালি জনতাকে দমন করতে সক্ষম হয়নি। ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, যশোরের মাইকেল মধুসূদন কলেজ[১৭৬], চট্টগ্রাম বার এ্যাসোসিয়েশন[১৭৭], বগুড়া মোক্তার বার এ্যাসোসিয়েশন[১৭৮] প্রভৃতি সংগঠন একুশে ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানায় ও নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে। আর ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, যশোরের ঝিনাইদাহ বার এ্যাসোসিয়েশন[১৭৯], রংপুর মোক্তার বার এ্যাসোসিয়েশন[১৮০], বাক্ষণবাড়িয়া বার এ্যাসোসিয়েশন[১৮১], ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জেলা বার এ্যাসোসিয়েশন[১৮২] প্রভৃতি সংগঠন একুশে ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানায়; একইসঙ্গে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা, নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ এবং গুলিবর্ষণ ঘটনোর জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠনের দাবী জানায়।

২৬শে ফেব্রুয়ারি (দুপুর ও অপরাহ্ন) নূরুল আমীনের মুসলিম লীগ সরকারের সশস্ত্রবাহিনী– সেনা ও পুলিশ বাহিনী মিলিতভাবে– বাঙালির নির্মিত প্রথম 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ'কে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। একে শাসকগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন করে দিলেও তারা বুঝতে পারেনি বাঙালির হৃদয়ে যে 'স্মৃতিস্তম্ভ' সৃষ্টি হয়েছে তা নিশ্চিহ্ন করার কোনো শক্তি তাদের নেই। 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ'টি ভেঙে দেওয়ার প্রেক্ষাপটে আলাউদ্দীন আল-আজাদ একটি কবিতা লিখেন।

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু আমরা এখনো
চার কোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো। যে-ভিত্ত কখনো কোনো রাজন্য
পারেনি ভাঙতে
হীরার মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার
খুরের ঝটিকা ধূলায় চূর্ণ যে-পদপ্রান্তে
যারা বুনি ধান
গুণ টানি, আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই
সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য।
ইটের মিনার
ভেঙেছে ভাঙক। ভয় কি বন্ধু, দেখ একবার আমরা
জাগরী চারকোটি পরিবার।

প্রসঙ্গত, ভাষা-আন্দোলনের প্রথম কবিতাটি রচিত হয় ২১শে ফেব্রুয়ারি। 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসীর দাবী নিয়ে এসেছি'-নামক কবিতাটি লিখেন চট্টগ্রাম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী।

২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ বাধ্য হয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন, এতে বলা হয় যে,

১. ঢাকা শহরে গুলিচালনোর ফলে যে-বেদনাদায়ক ঘটনাটি ঘটেছে, তার জন্য প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটি গভীর দুঃখ প্রকাশ করে নিহত ব্যক্তিদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে;

[176] University of Dhaka, D-Register, Bundle 54, No. 190. 1952.
[177] Government of East Bengal, B-Proceedings, Political Department, Political Brach, Bundle 65, No. 548, October 1952.
[178] Government of East Bengal, B-Proceedings, Political Department, Political Brach, Bundle 65, No. 307, October 1952.
[179] Government of East Bengal, B-Proceedings, Political Department, Political Brach, Bundle 65, No. 305, October 1952.
[180] Government of East Bengal, B-Proceedings, Political Department, Political Brach, Bundle 65, No. 669, October 1952.
[181] Government of East Bengal, B-Proceedings, Political Department, Political Brach, Bundle 65, No. 588, October 1952.
[182] Government of East Bengal, B-Proceedings, Political Department, Political Brach, Bundle 65, No. 306, October 1952.

২. হাইকোর্টের একজন বিচারপতি নিয়ে একটি নিরপেক্ষ উচ্চক্ষমতা বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির বিধান এবং নিহত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে;

৩. ঢাকা শহরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ১৪৪-ধারা ও সান্ধ্য-আইন তুলে নেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হচ্ছে;

৪. প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সংসদীয় পার্টি এবং প্রাদেশিক আইনসভা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার যে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছে তা যাতে গণপরিষদে গৃহীত হয় সেজন্য ওয়ার্কিং কমিটি সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে বদ্ধ পরিকর;

৫. ভাষা-আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বহু সন্ত্রাসবাদী ও কম্যুনিস্টকর্মী এবং পাকিস্তানের শত্রুর গুপ্তচর অলক্ষ্যে পাকিস্তানে প্রবেশ করে ভিত্তিহীন, উত্তেজনামূলক, অতিরঞ্জিত প্রচারণা ও গুজব রটিয়ে এবং অজস্র অর্থ ব্যয় করে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ক্ষমতালোলুপ কতিপয় ব্যক্তি একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে ইন্ধন যোগাচ্ছে। পুলিশ তদন্তে বহু বেআইনী, ধ্বংসাত্মক ও প্রচারণামূলক কাগজপত্র, কম্যুনিস্ট নীতিপূর্ণ পুঁথিপুস্তক এবং কিছু অস্ত্রশস্ত্রও ধরা পড়েছে। তাছাড়া কয়েকজন কম্যুনিস্ট সন্ত্রাসবাদী ও শত্রুপক্ষের চরকেও ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। দুর্ঘটনার তদন্তকার্য সমাপ্ত হওয়ার এবং লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও সরকার কর্তৃক অঙ্গীকৃত বিচার হওয়ার অপেক্ষা না করে দেশে এভাবে বেপরোয়া উত্তেজনামূলক আন্দোলন চালাতে থাকলে দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি ভঙ্গ হয়ে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।[১৮৩]

ভাষা-আন্দোলনকে কম্যুনিস্ট ও ভারতীয় চক্রান্ত এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যক্রম হিশেবে মুসলিম লীগের নেতৃবর্গ অভিহিত করার কারণ কম্যুনিস্ট ও ভারতীয় চক্রান্তের প্রচারতথ্য সহজেই পূর্ব-বাংলার জনগণের মনে দৃঢ়প্রত্যয় উৎপাদন করতে সাহায্য করে বলে তাদের বিশ্বাস; নেতৃবৃন্দ এছাড়াও চান ভাষা-আন্দোলনের প্রকৃতি সমস্যার ভিন্ন ব্যাখ্য প্রদান করে মূলবিষয় থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নিতে। সরকারি প্রেসবিজ্ঞপ্তি প্রচার করা সত্ত্বেও ২১-২২শে ফেব্রুয়ারির ঘটনাসমূহ বাঙালি জনতার মনে বিরূপ অসন্তোষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, বিশেষ করে 'অবজারভার' ও অন্যান্য পত্রিকার উপর গোপন সরকারি নিষিদ্ধকরণ, যা বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে অঞ্চলভেদে প্রকাশ পায়; ফলে দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে পুনরায় ১৪৪-ধারা জারি করা হয়, তবুও প্রতিবাদ বন্ধ হয়নি, এরসঙ্গে উত্থাপিত হয় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিশেবে স্বীকৃতিদানের দাবীও। অনশন ও ধর্মঘটের কারণে সরকার বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে ফরিদপুর জেল থেকে মুক্তি দেয়।

ভাষা-আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুখ্যভূমিকা রাখে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ, সমগ্র বাঙালি জাতি একে চিরদিন স্মরণে রাখবে। এই সংগঠনটিই ঘোষণা করে যে, ৫ই মার্চ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রদেশ ব্যাপী 'শহীদ দিবস' ও শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট পালিত হবে।

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩, নিশ্চিহ্ন 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ'টিকে কালো-কাপড় দিয়ে ঘিরে 'শহীদ দিবস' উদযাপন করার হয়; আর তখনই ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে একটি 'শহীদ মিনার' স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেসময় ঢাকা কলেজ ছিল রেলস্টেশনের পিছনে সিদ্দীক বাজারে। ইডেনের ছাত্রীরা এবং ঢাকা কলেজের ছাত্ররা মিলিতভাবে ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে একটি শহীদ মিনার গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ঢাকা কলেজের ছাত্র ইকবাল আনসারী খান, আতিকুল ইসলাম, এনাম আহমদ চৌধুরী প্রমুখের নেতৃত্বে ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার নির্মাণকাজ শুরু হয়, ইডেন কলেজের অধ্যক্ষা মিসেস ফজিলাতুন নেসা, ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ জহিরুল ইসলাম এবং উর্দুর অধ্যাপক আহসান আহমদ আসক প্রমুখের বাধা দেওয়া সত্ত্বেও।[১৮৪]

[১৮৩] ঢাকার গোলযোগ সম্পর্কে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের বিবৃতি, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।
[১৮৪] ড. রফিকুল ইসলাম, স্মৃতিচারণ, একুশের সংকল '৮২।

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩, ঢাকা কলেজ ছাত্রাবাস থেকে চার-পৃষ্ঠার একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয়, এর শিরোনাম ছিল 'ঢাকা কলেজ ছাত্রাবাসের পক্ষ থেকে জাতীয় জীবনে চিরস্মরণীয় ২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে যারা প্রাণ দিয়েছেন, সেই বীর শহীদের স্মরণে'; আর এতে ছিল তিনটি ছোটগদ্য রচনা, নজরুলের চারটি কবিতা থেকে চয়িত মোট ১২টি ছত্র ও শেষ পৃষ্ঠায় 'একুশের গান', কিন্তু রচয়িতার কোনো নাম ছিল না।[১৮৫] কবিতাটি মূলত আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী'র 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী'।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্ত রাঙানো ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলতে পারি ॥
জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী ॥
সেদিনও এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাতজাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে;
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকনন্দা যেন,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো ॥
সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা,
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই সারা বাংলার বুকে
ওরা এ দেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী ॥
তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারী
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বাল্‌বো ফেব্রুয়ারী
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী ॥

[১৮৫] বশীর আল্‌হেলাল, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৮৫।

আবদুল গাফফার চৌধুরীকে একদিন আহম্মদ হোসেন বলেছিলেন, 'তুমি নাকি একটি কবিতা লেখা শুরু করেছিলে দাউদের বাসায় বসে। লেখাটা শেষ করেছো কি? না করে থাকলে শেষ করে ফেলো। আমরা গেণ্ডারিয়ায় একটি গোপন সভা করব। সে সভায় ভাষা-আন্দোলনের পক্ষে একটি ইশতেহার তৈরি করা হবে। তারপর এটাকে প্রকাশ ও প্রচার করা হবে। সে ইশতেহারে তোমার কবিতাটি ছাপানো হবে বলে আমরা ঠিক করেছি। আবদুল্লাহ আল মুতী বলেছেন, গাফফার যেন কবিতাটি লিখে ফেলে।' একথা শোনার পর আবদুল গাফফার চৌধুরী কবিতাটি সমাপ্ত করেন। গেণ্ডারিয়ার সভায়, আবদুল্লাহ আল মুতীর উপস্থিতিতে, আবদুল গাফফার চৌধুরীর কবিতাটি পাঠ করা হয়।

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' কবিতাটিতে প্রথমে সুরকার, গীতিকার ও গায়ক আব্দুল লতিফ সুরারোপ করে বিভিন্ন মঞ্চে গাওয়া শুরু করেন। পরে সুরকার আলতাফ মাহমুদ গানটিতে নতুন সুর প্রয়োগ করেন। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' গানটির বাণীর তীক্ষ্ণতা ও সুরের ব্যঞ্জনায় হয়ে উঠেছে শহীদদের বেদনা, ক্ষোভ, সংকল্প ও প্রতিশোধের প্রত্যয়। গানটি বর্তমানে গাওয়া হয় আলতাফ মাহমুদের সুরেই।

বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী আব্দুল লতিফ ভাটিয়ালি, জারি, সারি থেকে শুরু করে আধুনিক গানও গেয়েছেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তার ছিল মজবুত ভিত্তি। বাংলা ভাষার প্রতি তার ছিল অগাধ ভালোবাসা, তাই তো তিনি লিখেছেন,

ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়।
ওরা কথায় কথায় শিকল পরায় আমার হাতে পায়
কইতো যাহা আমার দাদায় কইছে যাহা আমার বাবায়
এখন, কও দেখি ভাই সেই মুখে কি অন্য ভাষা শোভা পায়।
সইমু না আর সইমু না অন্য ভাষা কইমু না
যায় যদি ভাই দিমু সাধের জান। ...

মাতৃভাষার প্রতি অসামান্য মমতার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর এ গানে। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে এ গানটি গাওয়ার পর চারদিকে যেন দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। এ গানটি গাওয়ার অপরাধে, তাকে তাঁর বিয়ের প্রথম দিনই পুলিশ গ্রেফতার করতে তার বাড়িতে হানা দেয়। আব্দুল লতিফ ভাষা নিয়ে প্রায় এক শ গান লিখেছিলেন। সেগুলোর সুরও তিনি করেছিলেন এবং গেয়েও ছিলেন। এছাড়া তিনি ভাষা নিয়ে অন্যের লেখা গানেও সুরারোপ করেছিলেন।

সলিল চৌধুরীর গণসঙ্গীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুরমিশ্রণে আলতাফ মাহমুদ 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' গানটির সুর সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি গানটি বিভিন্ন সভা-সমিতিতে পরিবেশ করে গানটিকে গণসঙ্গীতে রূপান্তরিত করতে প্রচুর পরিশ্রম করেন। আলতাফ মাহমুদের স্বরচিত একটি গান হচ্ছে, 'মাগো আটই ফালগুনের কথা আমরা ভুলি নাই/ এদিন মায়ের ভাষার মান রাখিতে প্রাণ দিয়াছে আমার ভাই।'

গুলিস্তানের ব্রিটানিয়া হলে ঢাকা কলেজের নব-নির্বাচিত ছাত্র-সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠানে গানটি পরিবেশন করা হওয়ার পরের দিনই পাকিস্তান-সরকারের এক্সটা অর্ডিনারি গেজেটে গানটিকে ব্যান্ড করা হয়। এমনকী নব-নির্বাচিত ছাত্র-সংসদের ১১জন সদস্যকেও কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩, প্রভাতফেরির গান হিশেবে 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়'-এর পরিবর্তে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ'র 'আজকে স্মরিও তাঁরে, ভাষা বাঁচাবার তরে প্রাণ দিল যারা' গানটি গাওয়া হয়। এর আগে গাজীউল হক রচনা করেন 'ভুলব না, ভুলব না'-শীর্ষক রচনাটি।

ভুলব না, ভুলব না এ একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না,
লাঠি, গুলি, আর টিয়ার গ্যাস, মিলিট্যারি আর মিলিট্যারি– ভুলব না ।
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এ দাবিতে ধর্মঘট, বরকত সালামের খুনে লাল ঢাকার রাজপথ–
স্মৃতি-সৌধ ভাঙ্গিয়াছে জেগেছে পাষাণে প্রাণ,
মোরা কি ভুলিতে পারি খুনে-রাঙা জয়-নিশান?
ভুলব না ।

১৯৫২-এর ভাষা-আন্দোলন মুষ্টিমেয় ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীর আন্দোলন ছিল না, ছিল না শুধুমাত্র শিক্ষাগত বা সাংস্কৃতিক আন্দোলন, এ ছিল সামন্তবাদের তাবেদার পাকিস্তানি শাসক-শোষক শ্রেণীর জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালির এক ব্যাপক গণ-আন্দোলন, যার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় পূর্ব-বাংলার স্বাধীনতার দাবীটি। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রচণ্ড দমন-নির্যাতন-গ্রেফতার সত্ত্বেও, রক্তরঞ্জিত ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির ক্ষোভ-প্রতিবাদ-ঘৃণা তীব্ররূপে প্রকাশ পায়। এ-আন্দোলন পূর্ব-বাংলার রাজনৈতিক জনমানসে একটি নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তন করে; তাই পূর্ব-বাংলার মুক্তি-সংগ্রামে ভাষা-আন্দোলনের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন ও ভাষা-আন্দোলনের সূত্র ধরে পাকিস্তান জুড়ে বাঙালি সমাজ স্বায়ত্তশাসনের পথ ধরে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে, ফলে সূচিত হয় গণজীবনের পটপরিবর্তনের একটি নূতন অধ্যায়। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে প্রতি বছরই 'একুশে ফেব্রুয়ারি' উদযাপন করা হয়। স্বাধিকার ও পরবর্তীকালের স্বাধীনতার আন্দোলনের ভিতর দিয়ে আত্মবিস্মৃত বাঙালি-জাতি যে পুনরুজ্জীবন ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে তারই জিয়নকাঠি হচ্ছে মহান একুশে ।